
কিশলয়
সাহিত্য: তৃতীয় ভাগ

কিশলয়

সাহিত্য

তৃতীয় ভাগ

सत्यमेव जयते

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার

তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য

প্রকাশক
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার
রাইটার্স বিল্ডিংস্
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮১
পুনর্মুদ্রণ : নভেম্বর ১৯৮২
পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারী ১৯৮৩
পুনর্মুদ্রণ : নভেম্বর ১৯৮৫

মুদ্রণ :
প্রিন্ট এণ্ড ব্লক কনসার্ন (প্রিন্টার্স)
কলকাতা-৭০০ ০০২

ভূমিকা

রাজ্য শিক্ষা ও শিক্ষণ গবেষণা পর্ষদের সুপারিশক্রমে নূতন করে কিশলয় সাহিত্য তৃতীয় ভাগ লেখা হল। এ পুস্তকে বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের রচনার সংকলন সংযোজিত হয়েছে। ভাষা সাবলীল করার জন্য চলিত ভাষায় লিখিত রচনাগুলি গৃহীত হয়েছে। যাঁরা কিশলয় সাহিত্য তৃতীয় ভাগের জন্য রচনা নির্বাচন করে দিয়েছেন, লিখে দিয়েছেন এবং সেসব রচনা যেসব কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের প্রতি বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হল। আশা করা যাচ্ছে, এই নূতন কিশলয় পড়ে শিশুদের ভাষা, ছন্দ এবং অলংকারের প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ অধিকার জন্মাবে।

যেসব কৃতী সাহিত্যবিশারদ আমাদের এই পুস্তক রচনায় সাহায্য করেছেন তাঁদেরও আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে।

শিক্ষা অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ।

মহাকরণ,
কলিকাতা-৭০০ ০০১

সূচিপত্র

সাধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কত দিন ভাবে ফুল,
উড়ে যাব কবে,
যেথা খুশি সেথা যাব,
ভারি মজা হবে।
তাই ফুল একদিন
মেলি দিল ডানা।
প্রজাপতি হল, তারে
কে করিবে মানা?

রোজ রোজ ভাবে বসে
প্রদীপের আলো,
উড়িতে পেতাম যদি
হত বড়ো ভালো।
ভাবিতে ভাবিতে শেষে
কবে পেল পাখা
জোনাকি হল সে, ঘরে
যায় না তো রাখা।



পুকুরের জল ভাবে,
চুপ করে থাকি—
হায়, হায়, কী মজায়
উড়ে যায় পাখি।
তাই একদিন বুঝি
ধোঁয়া ডানা মেলে
মেঘ হয়ে আকাশেতে
গেল অবহেলে।



আমি ভাবি ঘোড়া হয়ে
মাঠ হব পার।
কভু ভাবি মাছ হয়ে
কাটিব সাঁতার।
কভু ভাবি, পাখি হয়ে
উড়িব গগনে।
কখনো হবে না সে কি
ভাবি যাহা মনে?





অনুশীলনী

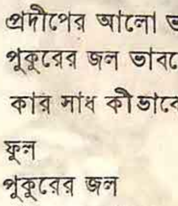
১. কে কী ভাবছে? (বাঁ দিকের অংশের সঙ্গে ডানদিকের ঠিক অংশটি মিলিয়ে উত্তর করো।)

ফুল ভাবছে	পাখিরা মজা করে উড়ে যায়।
প্রদীপের আলো ভাবছে	আমিও উড়তে পারলে ভালো হত।
পুকুরের জল ভাবছে	আমি যেখানে খুশি সেখানে উড়ে যাব।

২. কার সাধ কীভাবে মিটল? (একইভাবে উত্তর করো)

ফুল	একদিন মেঘ হয়ে আকাশে উড়ে গেল।
পুকুরের জল	একদিন প্রজাপতির মত ডানা মেলে দিল।
প্রদীপের আলো	জোনাকির পাখা পেয়ে গেল।

৩. মিল দাও



(১)
থাকত যদি ডানা
দুই পাশে দুই……
আকাশ ছুঁতাম পাখির মতো
করত না কেউ……।

(২)
উঠল ডাকি
একটি……।
একটু ভোরের আলো
লাগছে বড়োই….।

মৌখিক

১. কবিতাটি আবৃত্তি করো।

টুনটুনি আর বিড়ালের কথা



উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

গৃহস্থের ঘরের পিছনে বেগুন গাছ আছে। সেই বেগুন গাছের পাতা ঠোঁট দিয়ে সেলাই করে টুনটুনি পাখিটি তার বাসা বেঁধেছে।

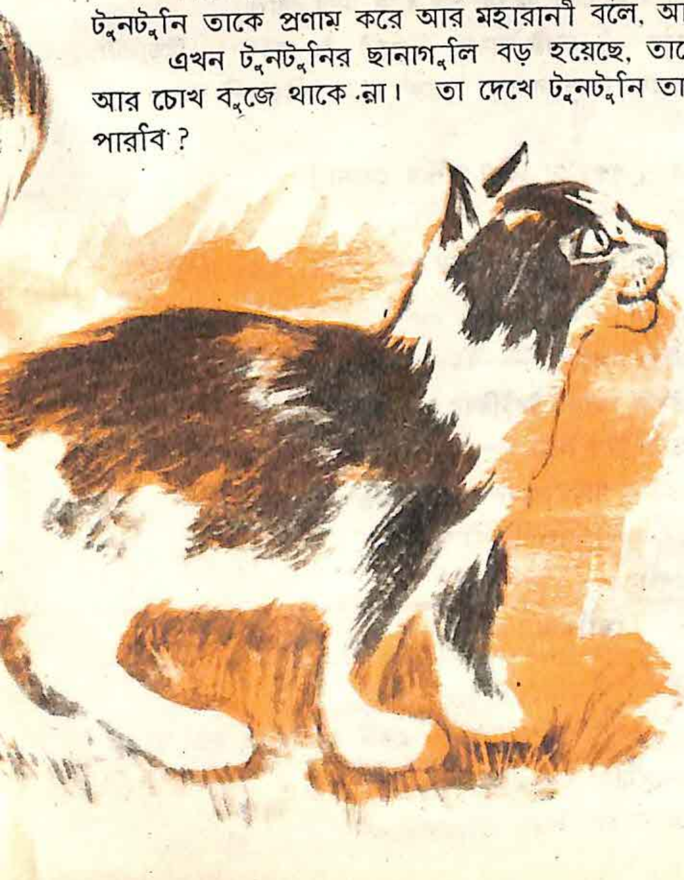
বাসার ভিতরে তিনটি ছোট্ট ছোট্ট ছানা হয়েছে। খুব ছোট্ট ছানা, তারা উড়তে পারে না, চোখও মেলতে পারে না। খালি হাঁ করে, আর চিঁ-চিঁ করে।

গৃহস্থের বিড়ালটা ভারি দুষ্টু। সে খালি ভাবে 'টুনটুনির ছানা খাবো। একদিন সে বেগুন গাছের তলায় এসে বললে, 'কী করছিস লা টুনটুনি?'

টুনটুনি তার মাথা হেঁট করে বেগুন গাছের ডালে ঠেকিয়ে বললে, 'প্রণাম হই মহারানী!'

তাতে বিড়ালনী ভারি খুশি হয়ে চলে গেল। এমনি সে রোজ আসে, রোজ টুনটুনি তাকে প্রণাম করে আর মহারানী বলে, আর সে খুশি হয়ে চলে যায়।

এখন টুনটুনির ছানাগুলি বড় হয়েছে, তাদের সুন্দর পাখা হয়েছে। তারা আর চোখ বুজে থাকে না। তা দেখে টুনটুনি তাদের বললে, 'বাছা, তোরা উড়তে পারবি?



ছানারা বললে, 'হাঁ মা, পারব।'

টুনটুনি বললে, 'তবে দেখ্ তো দেখি, ঐ তালগাছটার ডালে গিয়ে বসতে পারিস কি না!'

ছানারা তখনি উড়ে গিয়ে তালগাছের ডালে বসল। তা দেখে টুনটুনি হেসে বললে, 'এখন দুষ্টু বিড়াল আসুক দেখি!'





খানিক বাদেই বিড়াল এসে বলল, 'কী করছিস্ লা টুনটুনি'? তখন টুনটুনি পা উঠিয়ে তাকে লাথি দেখিয়ে বললে, 'দূর, হ লক্ষ্মীছাড়ী বিড়ালনী।' বলেই সে ফুড়ুক করে উড়ে পালাল।

দুষ্টু বিড়াল দাঁত খিঁচিয়ে লাফিয়ে গাছে উঠে, টুনটুনিকেও ধরতে পারল না, ছানাও খেতে পেল না। খালি বেগুন কাঁটার খোঁচা খেয়ে নাকাল হয়ে ঘরে ফিরল।

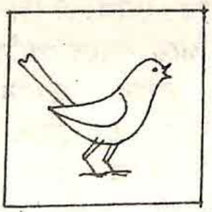
অনুশীলনী

১. দুধ থেকে ছানা হয়। 'ছানা' শব্দটি দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে আরো দুটি বাক্য তৈরি করো।

২. বন্ধনীর শব্দগুলোর জায়গায় গল্পটি থেকে একই অর্থের শব্দ খুঁজে নিয়ে বসাও।
টুনটুনি মাথা (নীচু) করল। ছোট্ট ছানা (শুধু) হাঁ করে। বিড়ালনী (প্রতিদিন) আসে। তারা চোখ (বন্ধ করে) থাকে না। বিড়ালনী খুব (জব্দ) হয়ে ফিরে যায়।

৩. বিড়ালটা কী দুষ্টুমি করেছিল? [শূন্যস্থানে কথা বসিয়ে লেখো]
বিড়ালটা —— খেতে চেয়েছিল।

৪. টুনটুনি কী ভাবে তার ছানাদের বাঁচিয়েছিল? [শূন্যস্থানে কথা বসিয়ে উত্তর করো]



বেড়াল এলেই টুনটুনি তাকে ——।
তাতে বেড়াল ——।
এমনি করে টুনটুনির ছানাগুলো ——।
তারা উড়ে গিয়ে ——।
বেড়াল আর তাদের খেতে পারল না।

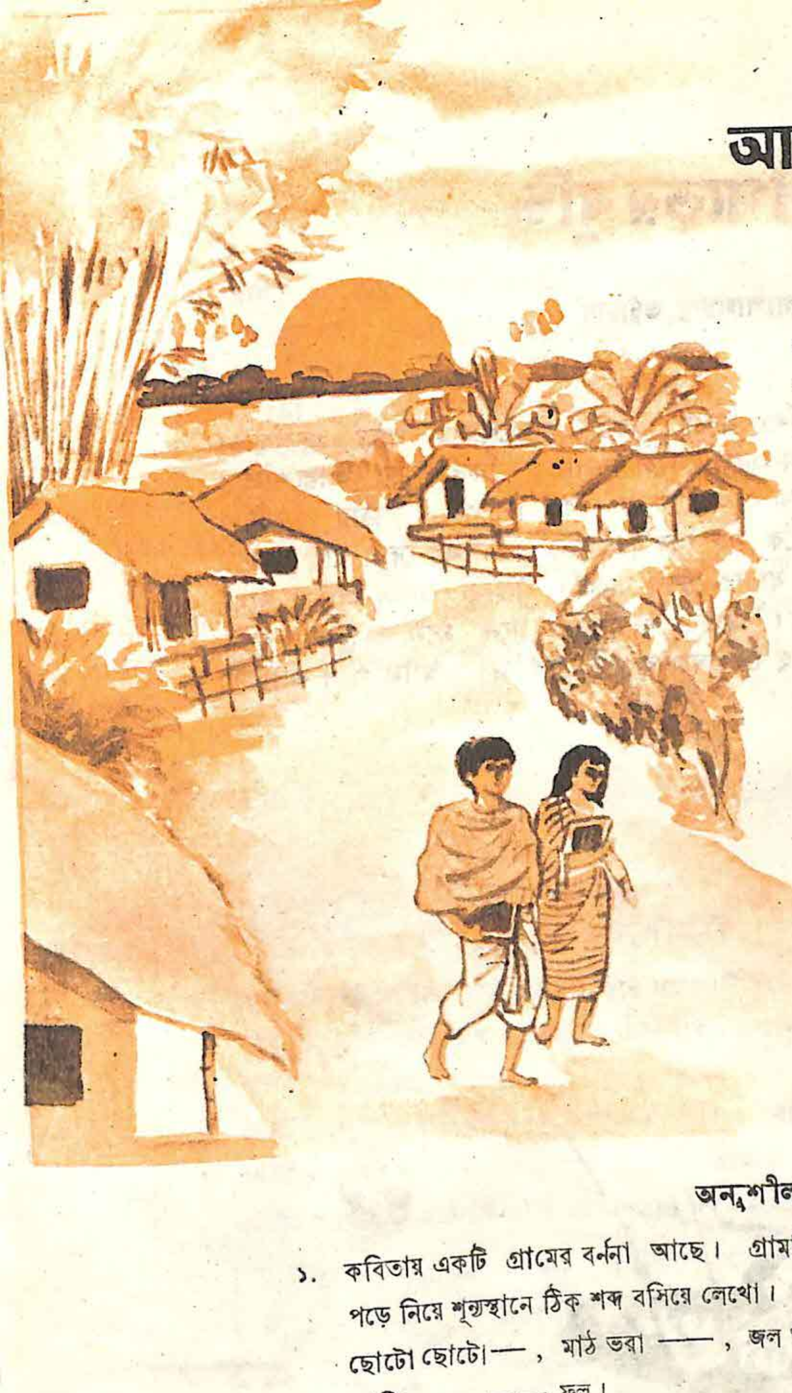
৫. ছানারা উড়ে গেল। বেড়াল এল। এবার টুনটুনি কী করল?

৬. দুষ্টু বেড়াল কী ভাবে জব্দ হল লেখো।

মৌখিক

১. বিড়ালটা কী ভাবে জব্দ হয়েছিল বলো।

২. শিক্ষকমহাশয়ের কাছ থেকে একটি বেড়ালের গল্প অথবা একটি পাখির গল্প শুনে নাও। তারপর সেই গল্পটি নিজে বলো।



আমাদের গ্রাম

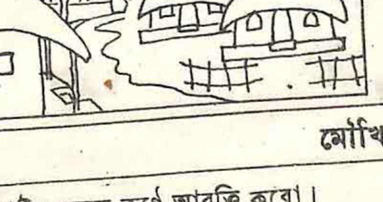
বন্দে আলি মিঞা

আমাদের ছোটো গাঁয়ে ছোটো ছোটো ঘর,
থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর
পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই,
এক সাথে খেলি আর পাঠশালে যাই।
হিংসা ও মারামারি কভু নাহি করি,
পিতামাতা গুরুজনে সদা মোরা ডরি।

আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান,
আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচায়েছে প্রাণ।
মাঠ ভরা ধান আর জল ভরা দিঘি,
চাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি।
আমগাছ জামগাছ বাঁশ ঝাড় যেন,
মিলে মিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন,
সকালে সোনার রবি পূব দিকে ওঠে
পাখি ডাকে বায়ু বয়, নানা ফুল ফোটে।

অনুশীলনী

১. কবিতায় একটি গ্রামের বর্ণনা আছে। গ্রামটিতে কী কী আছে? কবিতাটি ভালো করে পড়ে নিয়ে শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসিয়ে লেখো।
ছোটো ছোটো —, মাঠ ভরা —, জল ভরা —, চাঁদের — আমগাছ —
পাখি —, — ফুল।

২. 

ছবিটি খাতায় আঁকো।
নীচে লেখো আমাদের গ্রাম।
এই গ্রাম সম্বন্ধে ৫টি বাক্য লেখো।

মৌখিক

১. কবিতাটি সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি করো।
২. নিজেদের গ্রাম অথবা শহর সম্বন্ধে কয়েকটি বাক্য বলো।

পিঁপড়ের বুদ্ধি

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

একবার আমার আঠার শিশির মধ্যে একটা আরশোলা পড়ে মরেছিল। আরশোলা সমেত আঠা এক স্থানে ঢেলে ফেলে দিলাম। কিছু পরে আরশোলার দেহটা খাবার জন্য লাল রঙের এক প্রকার ক্ষুদে বিষ পিঁপড়ে আঠার চারদিক ঘেরাও করল। কলকাতার চারদিকে এই বিষ পিঁপড়ে সব সময় দেখা যায়। দু-চারটে পিঁপড়ে আরশোলার কাছে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তরল আঠার মধ্যে বন্দী হয়ে হাবুডুবু খেতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে মনে মনে ভাবলাম,—বেশ হয়েছে—এবার আর আরশোলার দেহ উদরসাৎ করতে হবে না। আমি পাশ কাটিয়ে কাজে চলে গেলাম।





প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এলাম। তখনও তারা মৃত আরশোলার দেহটার আশা ছাড়ে নি। বরং সেখানে পিঁপড়ের সংখ্যা আরও বেশি হয়েছে। একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। পিঁপড়েগুলির মুখে কণা কণা কাঁকর। কাঁকর মুখে করে আঠার ওপর তারা জড়ো করছে। সময়ের দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে তারা কাঁকর বয়ে নিয়ে গেল। আঠার ওপর তারা একটা কাঁকরের পথ তৈরি করে ফেলল। এখন দলে দলে পিঁপড়ে সেই পথের উপর দিয়ে এগুতে লাগল। এভাবে আরো এক ঘণ্টা কেটে গেল। তারপর দেখি—আরশোলাটার ছোট ছোট দেহখণ্ড মুখে করে কাঁকর পথ ধরে সার বেঁধে মহোল্লাসে তারা বাসার দিকে এগুচ্ছে।

অনুশীলনী

১. আরেকটি অর্থ দেখিয়ে প্রত্যেকটি শব্দ দিয়ে আরেকটি করে বাক্য গঠন করো—

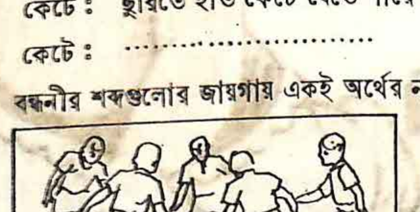
পাশ : আমি এবার পাশ করেছি। ধরে : আমগাছে আম ধরে।

পাশ : .... ধরে : ....

কেটে : ছুরিতে হাত কেটে যেতে পারে। তারা : রাত্রে আকাশে তারা দেখা যায়।

কেটে : .... তারা : ....

২. বন্ধনীর শব্দগুলোর জায়গায় একই অর্থের নতুন শব্দ বসাও। বইয়ের শেষে অভিধান দেখো—



মাঠে অনেক (ক্ষুদে ক্ষুদে) ছেলে জড়ো হয়েছে

কোনো দিকে তাদের (ভ্রূক্ষেপ) নেই।

(মহোল্লাসে) সবাই খেলা করছে।

দেখে ভারি (অদ্ভুত) লাগল আমার।

৩. পূর্ণ-বাক্যে উত্তর লেখো :

(ক) আরশোলাটা কীভাবে মারা যায়? (খ) তরল আঠার মধ্যে পড়ে পিঁপড়েদের কী দশা হল? (গ) পিঁপড়েরা কীভাবে পথ তৈরি করল? (ঘ) একঘণ্টা পর তারা কী করল?

মৌখিক

১. জীবজন্তু পশুপাখির বুদ্ধির কোনো গল্প শিক্ষকমহাশয়ের কাছ থেকে শুনে নাও। তারপর সেই গল্পটি নিজে বলো।



ডানপিটে

সুকুমার রায়

বাপ্‌রে কী ডানপিটে ছেলে!—
কোনো দিন ফাঁসি যাবে নয় যাবে জেলে।
একটা সে ভূত সেজে আঠা মেখে মুখে,
ঠাঁই ঠাঁই শিশি ভাঙে স্লেট দিয়ে ঠুকে!
অন্যটা হামা দিয়ে আলমারি চড়ে,
খাট থেকে রাগ করে দুম্‌দাম্ পড়ে!
বাপ্‌রে কী ডানপিটে ছেলে!—
শিলনোড়া খেতে চায় দুধভাত ফেলে!
একটার দাঁত নেই, জিভ দিয়ে ঘষে,
একমনে মোমবাতি দেশলাই চোষে!



আরজন ঘরময় নীল কালি গুলে,
কপ্ কপ্ মাছি ধরে মুখে দেয় তুলে!
বাপ্‌রে কী ডানপিটে ছেলে!—
খুন হত টম্ চাচা ওই রুটি খেলে!
সন্দেহে শুঁকে বুড়ো মুখে নাহি তোলে,
রেগে তাই দুই ভাই ফোঁস ফোঁস ফোলে।
নেড়াচুল খাড়া হয়ে রাঙা হয় রাগে,
বাপ বাপ বলে চাচা লাফ দিয়ে ভাগে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করো--
ঠাঁই ঠাঁই, দুম দাম, ফোঁস ফোঁস

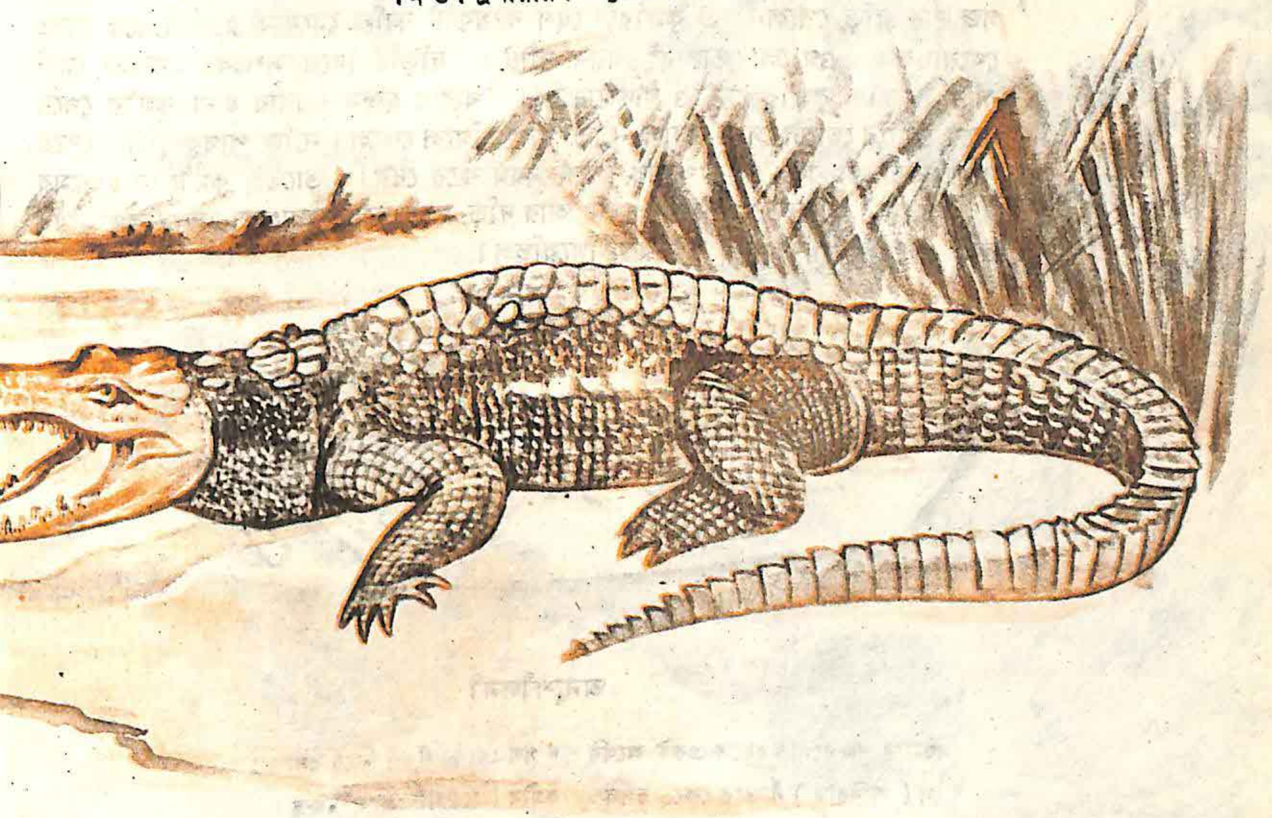
২. কে কী রকম শব্দ করে?
গরু। টিকটিকি। ঝড়। নদী। বেড়াল। পটকা। রেলগাড়ি। কানামাছি।

মৌখিক

দুই দলে ভাগ হয়ে কবিতাটি আবৃত্তি করো।

কুমীরের খিদে

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য



কুমীরের চোয়ালে ভীষণ জোর। কুমীরের দাঁতে ভীষণ ধার। চোয়ালের এক চাপে সে যে কোনো জন্তুর হাড় গুঁড়িয়ে দিতে পারে। আর এক কামড়ে সে মানুষের একটা পা ঊরুর নীচ থেকে কেটে নিয়ে যেতে পারে। তবে সে দাঁত দিয়ে চিবুনো যায় না। এই জন্য কুমীর ছোটো ছোটো শিকার এক রকম গিলেই খায়। বড়ো বড়ো জন্তু হলে তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে নিতে হয়। এই জন্য শিকার ধরে কুমীর তাকে জলের মধ্যে ক্রমাগত মোচড় দিতে থাকে। মোচড় খেয়ে খেয়ে শিকার অসাড় হয়ে পড়ে। তখন তাকে দাঁত দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। কিন্তু সময় সময় তাতেও অসুবিধে। এইজন্য কুমীর টাটকা মাংসের চাইতে একটু বাসি মাংস পছন্দ করে। তাই কখনও কখনও শিকারকে নদীর ধারে কোনো গর্তে লুকিয়ে রাখে। কুমীরের এই স্বভাবের জন্যই কুমীরের হাত থেকে অনেক মানুষ নিষ্কৃতি পেয়েছে। কুমীর মানুষ ধরে তাকে মাটি চাপা দিয়ে রেখে গেল। তারপর কুমীর চলে গেলে মাটি সরিয়ে লোকটি বেরিয়ে পড়ল।

কুমীর প্রায় সর্বভুক্। সুবিধে পেলে কোনো জন্তুই খেতে ছাড়ে না। আর পারলেই সে গিলে খায়। এই গিলে খাবার একটা ঘটনা শোনো।

একবার আফ্রিকার টাঙ্গানিকায় এক ইংরেজ শিকারি একটা কুমীর শিকার করলেন। তার পেট চিরে শিকারি তো অবাক্। পেটের মধ্যে ১১টা পেতলের বালা, ৩টে আর্মলেট, মানুষের হাতের আর পায়ের ১৪টা আস্ত হাড় এবং কয়েক গজ শক্ত দড়ি পেলেন। ঐ কুমীরটা বেশ কয়েকটি কাফ্রি মেয়ে আর পুরুষকে আস্ত খেয়েছিল। ওগুলো তাদেরই গয়নাগাঁটি। দড়িটি দিয়ে সম্ভবত কোনো মোট বাঁধা ছিল। কুমীর সেটাও বাদ দেয়নি। খাবার হজম করবার জন্য কুমীর খেয়ে দেয়ে ছোটো ছোটো গোল গোল নুড়ি পাথর গিলে ফেলে। নুড়ি পাথরগুলি পেটে গিয়ে নড়াচড়া করে করে খাবার পিষে নরম করে দেয়। তাতেই কুমীরের হজমের সুবিধা হয়। কিন্তু পেতলের গয়না আর দড়ি, হাড় হজম করা তো সহজ কথা নয়। তাই ওগুলো পাকস্থলীতেই রয়ে গিয়েছিল।



অনুশীলনী

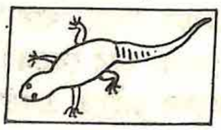
১. বন্ধনীর শব্দগুলোর বদলে একই অর্থের শব্দ গল্প থেকে খুঁজে নিয়ে বসাও :
সে (অবিরাম) সাঁতার কেটে চলল। কুমীর (সব খায় এমন) জন্তু।
সে একটা (গোটা) আনারস খেয়ে ফেলল। লোকটি (বোধ হয়) আমাকে চেনে।

২. বিপরীত অর্থের শব্দ লেখো—যেমন : নীচ—উপর।
সাড়—। সুবিধে—। বাঁধা—। ছোটো—। নরম—। সহজ—।

৩. কুমীর কেমন মাংস খেতে পছন্দ করে ?

৪. কুমীর গিলে খায় কেন ?

৫. টাঙ্গানিকায় কুমীরের পেটের মধ্যে কী কী পাওয়া গিয়েছিল ?

৬.  কুমীরের মতো দেখতে কোন্ জীব বাড়ির দেয়ালে দেখতে পাও ? সে কী করে শিকার ধরে লেখো।

মৌখিক

১. কুমীর ছোটো জন্তু কীভাবে খায় ?

২. কুমীর বড়ো জন্তু কীভাবে খায় ?

৩. তুমি ভাত, মাংস, জল কীভাবে খাও ?

ফুটফুটে জোছনায়

মোহিতলাল মজুমদার

ফুটফুটে জোছনায় জেগে শুনি বিছানায়
বনে কারা গান গায় ঝিমিঝিমি ঝুম্ঝুম্।
চাও কেন পিটিপিটি, উঠে পড় লক্ষ্মীটি!
চাঁদ চায় মিটিমিটি, বনভূমি নিঝ্ঝুম্!
ফাল্গুনে বনে বনে, পরীরা যে ফুল বোনে।
চলে এস ভাইবোনে, চোখ কেন ঘুম্ঘুম্?



অনুশীলনী

১. নীচের শব্দগুলোর সঙ্গে মিল আছে এমন শব্দগুলো কবিতা থেকে বেছে নিয়ে নীচে নীচে লেখো।

জোছনায় পিটিপিটি নিঝ্ঝুম্

....

২. কবিতা থেকে ঠিক আগের—শব্দগুলো বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও

......জোছনায়। ......চায়। ......বনে বনে।

মৌখিক

কবিতাটি আবৃত্তি করো।

চাকার কথা

কুঞ্জবিহারী পাল



ছোট্ট খোকা হাঁটতে পারে না। তা হলে এ ঘর থেকে ও ঘরে সে যায় কী করে? কেন, কোলে চড়ে।



পাহাড়ের ওপর রয়েছে মন্দির। সেখানে গিয়ে পুণ্য করতে চায় বয়স্ক লোক। কিন্তু পাহাড়ে ওঠবার শক্তি নেই। তখন? লোকের ঘাড়ে বসে যাওয়া ছাড়া উপায় কী? আর পয়সা দিলে ওরকম বাহন পাওয়াও কিছু কঠিন নয়।

চলা-ফেরার ব্যাপারে পায়ে হেঁটে, কোলে, পিঠে বা কাঁধে চড়ে যাওয়া আদিম উপায়।



মানুষ বুদ্ধিতে হল সব প্রাণীর সেরা। কাজেই চলা ফেরার ব্যাপারটার উন্নতি তারা করল। বনের পশুকে বশ মানিয়ে তাদের বাহন করল। তাদের পিঠে মালপত্তর চাপিয়ে আনা-নেওয়া চলল। তাঁদের পিঠে চড়ে যাতায়াত চলল। জন্তুর পিঠে চেপে বেড়ানোই কিন্তু চলাফেরার একমাত্র উপায় বলে মানুষ মনে করে নি। একাজে ডুলি, পালকিও তারা ব্যবহার করেছে। এও একরকম মানুষের কাঁধে চড়েই বেড়ানো। রাজা মহারাজা বা সমাজের ধনী লোকেরাই এগুলো ব্যবহার করতেন।



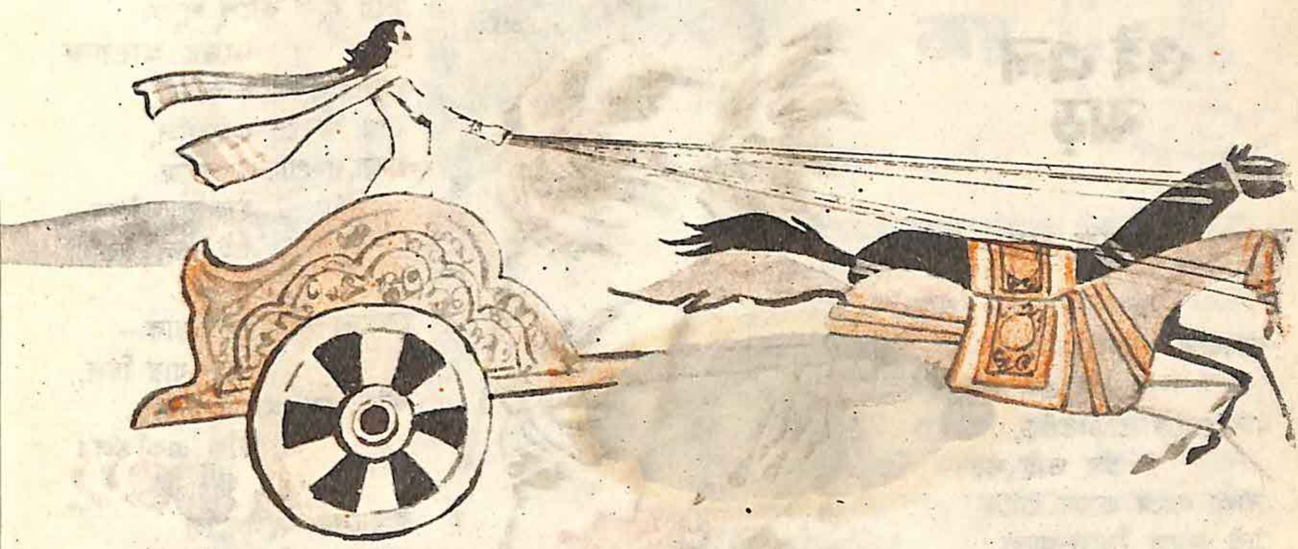
বুদ্ধিমান মানুষ আরও উন্নতির কথা ভাবতে লাগল। কম সময়ে কী করে যাতায়াত করা যায়? কম শ্রমে কী করে ভারী মালপত্তর বয়ে নেওয়া যায়? ভাবতে ভাবতে চাকার আবিষ্কার করল মানুষ। কে প্রথম চাকার আবিষ্কার করেছিল? কবে করেছিল? সে কথা আজ আর বলা সম্ভব নয়। তবে একটু কল্পনা করো। গাছের গুঁড়ি গড়িয়ে চলেছে। বুদ্ধিমান মানুষ দেখে দেখে ভাবল-বড়ো মজার, বড়ো মজার। হয়তো এই থেকে চাকার আবিষ্কার হল।





চাকার ধারণা কিন্তু ভারতে অনেক আগে এসেছিল। তবে আজকের চেহারার চাকা ছিল না। বহুদিন ধরে একটু একটু করে উন্নতি হয়ে তবেই চাকা তার বর্তমান রূপ পেয়েছে। প্রাচীন

কালের সভ্য জাতিরা সকলেই চাকার ব্যবহার জানত। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের একটা খেলনা গাড়ি পাওয়া গেছে। সে গাড়িতে চাকা লাগানো আছে। চাকার প্রথম ধারণার সময়টা নিশ্চয়ই তারও বহু দিন আগেকার ব্যাপার।



সে যা হোক। চাকার আবিষ্কার তো হয়ে গেল। আর ভাবনা কী? মানুষ বসবার বা দাঁড়াবার মতো, মালপত্তর রাখবার মতো একটা জায়গা বানিয়ে নিল। তার সঙ্গে জুড়ে দিল দুটো চাকা। এবার গরু, মোষ বা ঘোড়া দিয়ে টেনে নিলেই হল। ফলে পাওয়া গেল গাড়ি। ঘোড়ায় টানা গাড়ির ব্যবহার ছিল সবচেয়ে বেশি। সে সময় একে বলা হত রথ। কলকাতায় তোমরা ট্রাম দেখেছ। এক সময় এই ট্রাম গাড়িও ঘোড়ায় টানত।

আজকের দিনে প্রায় সব যন্ত্রই, প্রায় সব যানবাহনই চাকার সাহায্য নেয়। বলতে গেলে চাকাই গতির পথ খুলে দিয়েছে। মানব সমাজের অগ্রগতি ঐ চাকায় চেপেই এসেছে।

অনুশীলনী

১. 'জুড়ে', 'চেপে', 'পিঠে', 'সভ্য'—শব্দগুলো ঠিক জায়গায় বসাও।

সে হঠাৎ কান্না…দিল। আমাদের বাড়িতে আজ তালের…। তিনি আমাদের ক্লাবের…। আদিম মানুষ … ছিল না। এখানটায় হাত দিয়ে…রাখো। কাগজগুলো আঠা দিয়ে… দাও। আসল কথাটা সে … রেখেছে। সে ঘোড়ার … চেপে বসল।

২. আগেকার দিনে চলা-ফেরার জন্য মানুষ কী কী যানবাহন ব্যবহার করত?

৩. তুমি যে সব যানে চড়েছ সেগুলো সম্বন্ধে দুটি করে বাক্য লেখো।

মৌখিক

শিক্ষক মহাশয় চাকার সংখ্যা উল্লেখ করবেন। শিক্ষার্থীরা সেই সংখ্যক চাকার যানের নাম বলবে—দুই চাকা, তিন চাকা, চার চাকা, অনেক চাকা।

ওই এল ঝড়

সুনির্মল বসু



শালবনে হুল্লোড়—
ওই এল ঝড়,
মাঠ ছেড়ে তাড়াতাড়ি,
চল ভাই ঘর।
দোলা লাগে ডালে ডালে
ঢেউ জাগে বিলে-খালে,
উড়ে যায় ধুলো-বালি
পথের উপর,
ওই এল ঝড়।

আশমানে জমে মেঘ—
কালো ঘুট্‌ঘুট্‌—
তুফানের বাড়ে বেগ,
দে রে ছুট্‌ ছুট্‌ ;
মাঝ-নদী ছেড়ে মাঝি
কূলে আনে তরী আজি,
কোথা যেন বাজ পড়ে
কড়্‌ কড়্‌ কড়্‌ ;
ওই এল ঝড়।

আম বাগানেতে গিয়ে
কাজ নাই আজ,
ডরে বুক কাঁপে শুনে
ঝড়ের আওয়াজ ;
তালবনে খালি খালি
দেয় কে রে করতালি,
খেজুর পাতায় বাজে
হাজার ঝাঁজর—
ওই এল ঝড়।

ঝোড়ো-কাকে দেয় ডাক—
উড়ে যায় চিল,
ফাঁকা সে আকাশে নাই
ফাঁক একতিল।

বাগানের ফুলগুলি
ঝরে যায় বিলকুলই
নীড়-হারা বুলবুলি
কাঁপে থর থর—
ওই এল ঝড়।

ঘরে বসে চুপচাপ
থাক না-এখন,
চুপ করে বসে দেখ
ঝড়ের মাতন—
ওপারে গ্রামের 'পরে
আকুল বাদল ঝরে,
জলছবি ভেসে ওঠে
অতি মনোহর—
ওই এল ঝড়।

অনুশীলনী

১. মিল আছে এমন শব্দগুলো বেছে নিয়ে নীচে নীচে লেখো।
ঘুটঘুট, কড়্‌কড়্‌, খালি খালি, ফুলগুলি, একতিল,

২. কবিতা থেকে নিয়ে শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসাও।
……হুল্লোড় লাগল। ……ঢেউ উঠল। ……ধুলোবালি উড়ল।
আকাশে…… জমল। তুফানের…… বাড়ল। মাঝি নৌকাটি……নিয়ে এল।

মৌখিক

কবিতাটি সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি করো।



এভারেস্ট জয়

আধখানা চাঁদের মতো ভারতের উত্তরদিক জুড়ে রয়েছে হিমালয় পর্বতমালা। এই হিমালয়ের সব চেয়ে উঁচু শিখরের নাম এভারেস্ট। এটিই পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিচূড়া। এর উচ্চতা ৮,৮৪৮ মিঃ। দার্জিলিঙের টাইগার হিল থেকে এভারেস্ট শৃঙ্গটি দেখতে পাওয়া যায়। চির তুষারে ঢাকা এই গিরিচূড়া। উষার আলো এভারেস্টের উপর পড়ে অপরূপ রঙের ছটায় চারদিক ভরে দেয়।

দীর্ঘকাল ধরে এভারেস্ট মানুষকে হাতছানি দিয়েছে। সে যেন মাথা তুলে বলেছে—এসো তো মানুষ। দেখি, আমাকে জয় করো। মানুষ সেই আহ্বানকে গ্রহণ করেছে। বাঙালী বিজ্ঞানী রাধানাথ শিকদার অংক কষে এভারেস্টের উচ্চতা মেপে দিলেন। দেশ দেশ থেকে পর্বতারোহীরা জয় করতে এগিয়ে এলেন। কী দারুণ ঝুঁকি নিয়েছে মানুষ। কত প্রাণ গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত মানুষই বিজয়ী হয়েছে। সর্বোচ্চ ঐ চূড়ায় মানুষের জয়ের পতাকা উড়েছে।

এভারেস্ট জয় করতে প্রথম অভিযান হয়েছিল ১৯২১ সালে। মানুষ এটি প্রথম জয় করে ১৯৫৩ সালের ২৯ মে। সেদিন শেরপা তেনজিং নোরগে আর এডমন্ড হিলারি এই দুজন এভারেস্টের চূড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন। এরপর অনেকবার এভারেস্ট জয় হয়েছে।

নেপালের নামচে বাজার থেকেই অভিযান শুরু হয়। সেখানে প্রথম তাবু ফেলা হয়। তারপর পাহাড়ী পথ বেয়ে খুব সতর্ক হয়ে ওপরে উঠতে হয়। সমতলের ওপর দিয়ে হাঁটা আর পাহাড়ী পথে চলার মধ্যে অনেক তফাত। কিছুটা ওপরে ওঠবার পর গাছপালা বা পাখির দেখা মেলে না। আরও ওপরে বাতাস হালকা হয়ে যায়, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। দরকার হয় অক্সিজেনের। বিশাল বিশাল তুষারের চাঙড় কিংবা ঝুরঝুরে বরফের ওপর পা ফেলে ফেলে চলতে হয়। কুঠার দিয়ে তুষার কেটে পথ তৈরি করে নিতে হয়।

প্রথমবারের সফল অভিযানে আট নম্বর শিবির থেকে দুজন অভিযাত্রী তেনজিং নোরগে আর এডমন্ড হিলারি এভারেস্টে পৌঁছেছিলেন। শেষের তাঁবুটা তাঁরা ফেললেন একটা সংকীর্ণ জায়গায়। তারপর ওপরে নিচে দুটো থাক করে দু'জনে ঘুমিয়ে পড়লেন।



সকালে উঠতে গিয়ে তাঁরা চমকে উঠলেন। পা এত ভারি কেন? জুতো কোথায়? ঘুমের মধ্যে তাদের পায়ের জুতোর ওপর বরফ জমে গেল। প্রকৃতি যেন তাঁদের এভারেস্ট জয় করতে দেবে না। কিন্তু মানুষ প্রকৃতিকে জয় করবেই। দুজনে স্টোভ জেবলে ঐ বরফ গলিয়ে ফেললেন। তারপর বেরিয়ে পড়লেন। দড়ি দিয়ে পরস্পরের পিঠ বেঁধে নিয়ে তাঁরা তুষার কেটে কেটে এগিয়ে চললেন। একটু অসতর্ক হলেই মৃত্যু। কিন্তু সাহস আর মনোবল নিয়ে তাঁরা অবশেষে পৌঁছে গেলেন জয়ের শীর্ষে।

মানুষ জয় করল বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গকে।

অনুশীলনী

১. একই অর্থের শব্দগুলো খুঁজে নিয়ে পাশাপাশি লেখো

অপরূপ—...,......	(খুব সুন্দর, কিরণ
ছটা—...,......	অপূর্ব,
আহ্বান—...,......	আলো, ডাক, আগা,
শীর্ষ—...,......	চূড়া, নিমন্ত্রণ)

২. এভারেস্ট কী?

৩. এর উচ্চতা কত?

৪. এই উচ্চতা কে কেমন করে মেপেছিলেন?

৫. কারা প্রথম এভারেস্টের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করেন? কোন্ তারিখে?

৬. পাহাড়ী পথে ওপরে উঠতে কী কষ্ট হয়?

মৌখিক

১. এভারেস্ট জয়ের প্রথম অভিযান কোন্ সালে হয়েছিল?

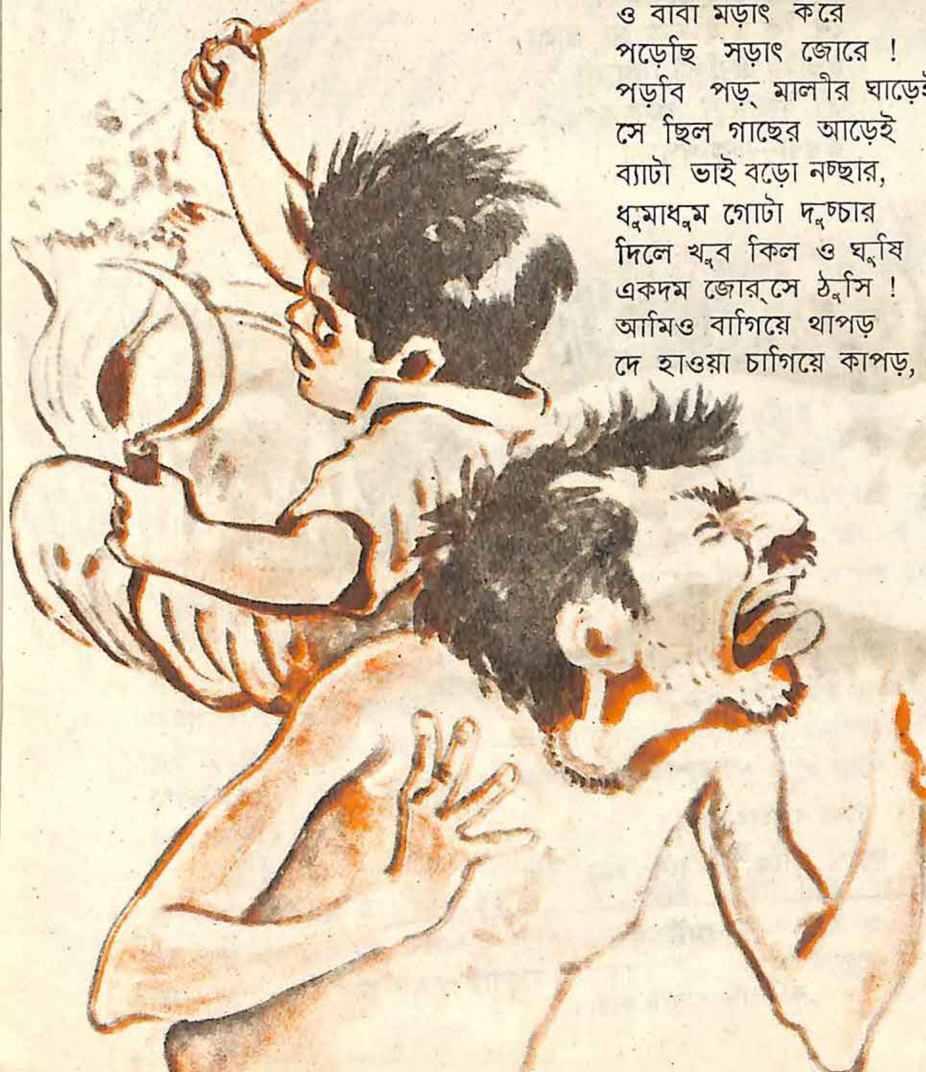
২. এভারেস্ট অভিযান কোন্ জায়গা থেকে শুরু হয়?

লিচুচোর

নজরুল ইসলাম



বাবুদের তাল-পুকুরে
হাবুদের ডাল-কুকুরে
সে কি বাস্ করলে তাড়া
বলি থাম্ একটু দাঁড়া !
পুকুরের ঐ কাছে না
লিচুর এক গাছ আছে না.
হোথা না আস্তে গিয়ে
য়্যাব্বড় কাস্তে নিয়ে
গাছে গে যেই চড়েছি,
ছোট এক ডাল ধরেছি,



ও বাবা মড়াৎ করে
পড়েছি সড়াৎ জোরে !
পড়বি পড়্ মালীর ঘাড়েই,
সে ছিল গাছের আড়েই
ব্যাটা ভাই বড়ো নচ্ছার,
ধুমাধুম গোটা দুচ্চার
দিলে খুব কিল ও ঘুষি
একদম জোর্‌সে ঠুসি !
আমিও বাগিয়ে থাপড়
দে হাওয়া চাগিয়ে কাপড়,

লাফিয়ে ডিঙ্‌নু দেয়াল,
দেখি এক ভিট্‌রে শেয়াল !
আরে ধ্যাৎ শেয়াল কোথা
ভেলোটা দাঁড়িয়ে হোথা !
দেখে যেই আঁৎকে ওঠা !
কুকুরও জুড়লে ছোটা !
আমি কই কম্ম কাবার
কুকুরেই করবে সাবাড় !
'বাবা গো মাগো'—বলে
পাঁচিলের ফোঁকল গলে



ঢুকি গে বোস্‌দের ঘরে,
যেন প্রাণ আস্‌লো ধড়ে !
যাব ফের? কান মলি ভাই,
চুরিতে আর যদি যাই !
তবে মোর নামই মিছা !
কুকুরের চাম্‌ড়া খিঁচা
সে কি ভাই যায় রে ভুলা—
মালীর ঐ পিট্‌নিগুলা,
কী বলিস? ফের হপ্তা?
তওবা—নাক-খপ্‌তা !

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো বাক্যে ব্যবহার করো :

তাড়া, মড়াৎ, কাস্তে, জোর্‌সে. ধড়ে, হপ্তা

মৌখিক

কবিতাটি আবৃত্তি করো।



মহিষে মানুষে

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

একবার আমরা কয়েকজন মিলে সুন্দরবনে মহিষ শিকারে গিয়েছিলাম। পথে একটা খাল পার হতে হয়েছিল। সেখানে তালগাছের তৈরি একরকম ডোঙা পাওয়া যায়। তাতে কষ্টেসৃষ্টে দু'জন লোক বসতে পারে। আমরা অতি কষ্টে খাল পার হলাম। একটা ঘাসবনের আড়ালে আড়ালে অগ্রসর হতে লাগলাম। সামনেই দেখি একদল মহিষ। সুযোগ দেখে একটাকে গুলি করলাম। মহিষটা মাটিতে পড়ে গেল। তখন দলের অন্য মহিষগুলো ক্ষেপে উঠে আমাদের তাড়া করল। আমরা তাড়াতাড়ি ডোঙায় উঠে গভীর জলে যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সবগুলি ডোঙাই উল্টে গেল। বড় বিপদ। উল্টানো ডোঙা ধরে কোনো ক্রমে আমরা গভীর জলে এসে পড়লাম। মহিষগুলো অনেক দূর পর্যন্ত আমাদের পেছনে পেছনে তাড়া করে এসেছিল। অবশেষে জল গভীর দেখে রাগে শিং নাড়তে নাড়তে চলে গেল।

মহিষের পাল চলে গেলে মৃত মহিষটার শিং আনবার জন্য আমি বাঁকা পথ ঘুরে তার কাছে উপস্থিত হলাম। মহিষটার লেজ ধরে আমি টানতে টানতে আনন্দে চিৎকার করে আমার দলের লোকদের ডাকতে লাগলাম। এমন সময় কী সর্বনাশ! মহিষটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল। শিং পেতে আমাকে গুঁতোতে এল।

লেজটা খুব শক্ত করে ধরে ছিলাম। তাই সে আমাকে গুঁতোতে পারল না। কিন্তু আমাকে নিয়ে লাটিমের মত ঘুরতে লাগল। হাত ছেড়ে গেলেই মৃত্যু। আমি প্রাণপণে লেজ ধরে তার সঙ্গে ঘুরতে লাগলাম। আমার মাথার টুপি উড়ে গেল। সঙ্গী লোকজন ভয়ে পালিয়ে গেল। আমি প্রাণরক্ষা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়লাম। এমন সময় মহিষটা হঠাৎ মাটিতে পড়ে গেল। আমি স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। ভয়ে ভয়ে ওর দিকে তাকালাম। এবার সে সত্যিই মরে গেছে। সে যাত্রা আমি বেঁচে গেলাম।



অনুশীলনী

১. বন্ধনীর শব্দগুলোর বদলে একই অর্থের অন্য শব্দ বসাও :
আমি গাছের (আড়ালে) বানরটিকে দেখলাম। কাছে গিয়ে ওটাকে ধরার (সুযোগ) খুঁজতে লাগলাম। (আস্তে আস্তে) (অগ্রসর হতে) লাগলাম। পেছনে একটা খরগোস (তাড়া) করল।

২. বিপরীত অর্থের শব্দ বেছে নিয়ে লেখো :
(ধীরে ধীরে, সামনে, অস্থির, সোজা)
তাড়াতাড়ি—, পেছনে—, বাঁকা—, স্থির—।

৩. লেখক কী জন্যে সুন্দরবনে গিয়েছিলেন ?

৪. তিনি কিসে করে খাল পার হলেন ?

৫. তিনি কোথা থেকে মহিষটাকে গুলি করেছিলেন ?

৬. দলের অন্য মহিষগুলো তখন কী করল ?

৭. লেখক আবার মহিষটার কাছে গিয়েছিলেন কেন ?

৮. গৃহপালিত মহিষ মানুষের কী কী উপকার করে ? (পাঁচটি বাক্যে লেখো।)

মৌখিক

১. সুন্দরবন কোথায় ?

২. সুন্দরবনের বিখ্যাত বাঘের নাম কী ?

বিদ্যাসাগর



নাম তাঁর ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু লোকে তাঁকে বিদ্যাসাগর নামেই বেশি চেনে। ঈশ্বরচন্দ্র বড় দুঃখ কষ্ট সহ্য করে বিদ্যাসাগর হয়েছিলেন।

১৮২০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন বড় অশান্ত ও একগুঁয়ে। কারো আদেশ ও নিষেধের বিপরীত কাজ করতেই তিনি ভালবাসতেন। লোকে তাঁর দৌরাত্ম্যে অস্থির হয়ে উঠত। কিন্তু পড়াশোনায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের বিন্দুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। ঐ একগুঁয়েমি নিয়েই তিনি পড়াশোনা বা যে কোনো একটা কাজ হাতে নিয়ে শেষ না করে ছাড়তেন না।

গ্রামের পাঠশালার পাঠ শেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কলকাতায় আসেন। ন বছর বয়সে তিনি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। কলকাতার বাসায় নানা অসুবিধা ও দারিদ্র্যের মধ্যে বাবা ও ভাইয়ের সঙ্গে তিনি বাস করতেন। বাজার করা, বাটনা বাটা, উনান ধরানো, রান্না করা, বাসন মাজা সবই তাঁকে করতে হত। রান্না করতে করতে ও স্কুলে যাবার পথে তিনি পড়া তৈরি করতেন। সব অসুবিধার সঙ্গে বাল্যের সেই দারুণ জেদ নিয়ে যুদ্ধ করে একুশ বছর বয়সে তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন।

পড়া শেষ করে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপক হন। এই সময় তিনি ইংরেজি শেখেন এবং ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হন। একত্রিশ বছর বয়সে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন

তখন এদেশ শাসন করত ইংরেজরা। এদেশের সাধারণ মানুষের শিক্ষার দিকে তাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। বিদ্যাসাগর এগিয়ে এলেন। গ্রামে গ্রামে স্কুল গড়ে তোলবার ব্যবস্থা তিনি করতে লাগলেন। মেয়েদের শিক্ষার দিকে তখন পর্যন্ত তেমন কারও নজর ছিল না। এখানেও এগিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর। তিনি প্রথমে নিজের গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। পরে তাঁরই চেষ্টায় চারটি জেলায় পঞ্চাশটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'বর্ণ পরিচয়', 'কথামালা', 'বোধোদয়', এইসব পাঠ্য বই রচনা করলেন। এইভাবে দেশের সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে তিনি শিক্ষার প্রসার ঘটালেন।

বিদ্যাসাগর দয়ার সাগরও ছিলেন। অপরের দুঃখকে তিনি নিজের দুঃখ বলে মনে করতেন। পঙ্গু, অক্ষম, রোগী, দুঃখীকে রাস্তা থেকে তুলে এনে তিনি শুশ্রূষা করতেন। এমন কি তাদের অসুখের চিকিৎসা করবার জন্য তিনি হোমিও-প্যাথি প্রথায় চিকিৎসা করতেও শিখেছিলেন। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের একদিনের একটা ঘটনা শোনো।—

বিদ্যাসাগর বর্ধমান শহর থেকে হেঁটে চলেছেন কালনার পথে। সঙ্গে রয়েছেন গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। কালনায় তাঁরা জরুরি কাজে চলেছেন। থমকে দাঁড়ালেন বিদ্যাসাগর। রাস্তার পাশে একজন পথিক পড়ে আছে। তার কলেরা



হয়েছে। কাপড়-চোপড় ময়লামাখা। তার দেহেও ময়লা। পথে কত লোক চলছে। কিন্তু সকলে নাকে মুখে কাপড় দিয়ে সরে যাচ্ছে। বিদ্যাসাগর দ্রুত এগিয়ে রোগীকে কাঁধে তুলে নিলেন। তাকে কাঁধে নিয়ে আধ ঘণ্টা হেঁটে কালনা হাসপাতালে এলেন। সাহেব ডাক্তারকে ডেকে বললেন, "ডাক্তার, একে বাঁচাতেই হবে। কথা দিন ভালো চিকিৎসা হবে।" ডাক্তার একটু বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, "চিকিৎসার ত্রুটি হবে না। কিন্তু জানতে ইচ্ছা করে আপনি কে?" বিদ্যাসাগর বললেন, "আমি এমন কেউ নই। লোকে আমাকে বিদ্যাসাগর বলে।" ডাক্তার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

১৮৯১ সালে ২৯ জুলাই বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়। সে দিনটি ছিল সমগ্র জাতির কাছে শোকের দিন।

অনুশীলনী

১. বন্ধনীর শব্দগুলোর বদলে একই অর্থের শব্দ এই রচনা থেকে বেছে নিয়ে বসাও :
   শৈশবে অনেক ছেলেই (দুরন্ত) থাকে। কেউ কেউ হয় (অবাধ্য)। কারো কারো (দুরন্তপনায়) অনেকে রেগে যায়। কারো কারো কাজে (ঢিলেমি) দেখা যায়। অনেকের দিন কাটে (অভাবের) মধ্যে। তবু অনেকে পড়াশোনায় বেশ (পটু) হয়ে ওঠে। (খোঁড়া), (দুর্বল) দের সাহায্য করার জন্য ছোটোরাই এগিয়ে আসে। রোগীর (সেবা) করতে তারা উৎসাহী হয়।
২. বিদ্যাসাগর তো উপাধি ; তাঁর নাম কী ?
৩. শৈশবে পড়াশোনার সময় তাঁকে কী কী অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল ?
৪. বিদ্যাসাগরের লেখা পাঠ্য বইগুলির নাম লেখো।
৫. তোমার পাঠ্য বইগুলির নাম লেখো।
৬. ডাক্তারকে বিদ্যাসাগর কী বলেছিলেন ?

মৌখিক

১. বিদ্যাসাগরের রোগী সেবার ঘটনা বলো।
২. শিক্ষকমহাশয়ের কাছ থেকে বিদ্যাসাগরের জীবনের আরো-দুএকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা শুনে নাও।
৩. বিদ্যাসাগরের জীবনের অনেক দিকের কথা বলা হয়েছে। কোন্ দিক তোমার ভালো লেগেছে, এবং কেন— মুখে মুখে বলো।

দামোদর শেঠ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অল্পেতে খুশি হবে দামোদর শেঠ কি?
মুড়কির মোয়া চাই, চাই ভাজা ভেটকি।
আনবে কটকি জুতো, মটকিতে ঘি এনো,
জলপাইগুড়ি থেকে এনো কই জিয়োনো।
চাঁদনিতে পাওয়া যাবে বোয়ালের পেট কি?
চিনেবাজারের থেকে এনো তো করমচা,
কাঁকড়ার ডিম চাই, চাই যে গরম চা।
না হয় খরচা হবে, মাথা হবে হেঁট কি?
মনে রেখো, বড়ো মাপে করা চাই আয়োজন-
কলেবর খাটো নয়, তিন মোন প্রায় ওজন।
খোঁজ নিয়ো ঝরিয়াতে জিলিপির রেট কী॥



অনুশীলনী

১. কবিতাটিতে কী কী খাবারের নাম আছে, লেখো।

মৌখিক

১. জলপাইগুড়ি ও ঝরিয়া কোথায়?
২. কবিতাটি আবৃত্তি করো।

দেশরক্ষা

বহুদিন আগেকার কথা। তখন উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ গৌড় নামে পরিচিত ছিল। এই গৌড়-এর পাল রাজবংশ এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল।

এই বংশের পরাক্রান্ত রাজা রামপাল। একদিকে গঙ্গা—অপরদিকে করতোয়া নদী—মধ্যখানে তিনি রাজধানী স্থাপন করলেন। নাম তার রামাবতী।

রামপালের মৃত্যুর পর তার পুত্র কুমারপাল গৌড়ের রাজা হলেন।

তাঁর প্রিয় বন্ধু এবং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বৈদ্যদেব। কুমারপালের চেয়েও এই বৈদ্যদেবের নাম তখন ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ তিনি ছিলেন বীর যোদ্ধা এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান।

কুমারপাল রাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কামরূপের রাজা গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু বৈদ্যদেব তাঁকে পরাজিত করে ফিরে এলেন। রামাবতী রাজপ্রাসাদে চলল বিজয়োৎসব। সবাই তখন বিজয় উৎসবের আনন্দে মত্ত। এমন সময় এক দুঃসংবাদ এল। কলিঙ্গরাজ অনন্তবর্মা সৈন্যসামন্ত নিয়ে গৌড়ের দিকে এগিয়ে আসছেন। স্থলপথে, জলপথে দুই পথেই কলিঙ্গ সৈন্য আসছে।

বৈদ্যদেব স্থলপথে অনন্তবর্মাকে বাধা দিলেন। কলিঙ্গ সৈন্যরা পিছু হঠল। অনন্তবর্মা তখন জলপথে সৈন্যসংখ্যা বাড়ালেন। তারপর নিজেই সেই সৈন্যদের পরিচালনা করতে লাগলেন। কিন্তু রামাবতীর পথ তাঁর ভালো-ভাবে জানা ছিল না।





এমন সময় একটি লোক এসে রাজা অনন্তবর্মার কাছে কিছু সাহায্য চাইল। লোকটির অনেক বয়স। মাথার চুলে পাক ধরেছে। কিন্তু চেহারা বলিষ্ঠ। সে হাতজোড় করে বলল,—"মহারাজ, আমি এক দরিদ্র ভিক্ষুক। আমাকে কিছু সাহায্য করুন।" রাজা বললেন,—"তুমি গৌড়ে বাস কর?" "হাঁ মহারাজ।" বৃদ্ধ বলল। রাজা খুশি হয়ে বললেন, "তোমাকে সাহায্য করতে আমি রাজি। কিন্তু একটা কথা। আমি গৌড় বিজয়ে অগ্রসর হয়েছি। পথ ভালো চিনি না। তুমি আমাকে রামাবতীর পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো। গৌড় জয় করে তোমাকে একটা অঞ্চলের রাজা করে দেব।" লোকটি বলল, "রাজা হবার লোভ আমার নেই মহারাজ। সামান্য কিছু সাহায্য পেলেই আমি খুশি।"

রাজা এবার অসন্তুষ্ট হলেন। বৃদ্ধ নরম হয়ে বলল, "আচ্ছা, আমি পথ দেখাব। আমাকে একখানি নৌকা দিন, দুজন চালক দিন। আমি আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।"

তাই হল। লোকটি নৌকায় চড়ে পথ দেখাতে লাগল। নৌবাহিনী তার পেছনে অগ্রসর হল। অনন্তবর্মা খুব খুশি। গৌড়বাসীটি লোভে পড়ে তাকে সাহায্য করছে। এর সাহায্যেই সে গৌড় জয় করবে।

বৃদ্ধের নৌকা তীর বেগে ছুটে চলেছে। এ-বাঁক সে-বাঁক করে নৌকা এগিয়ে চলেছে। আর নৌবাহিনী তার অনুসরণ করছে। সৈনিকরাও উৎসাহে উদ্দীপ্ত। আর কতদূরই বা রামাবতী!

হঠাৎ নদীর একটা বাঁক ফিরতেই বৃদ্ধের নৌকাটি হারিয়ে গেল। নৌ-বাহিনীর আগের নৌকাতে ছিলেন রাজা অনন্তবর্মা। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। কোথায় সেই গৌড়বাসী বৃদ্ধ? কোথায় নৌকা?

অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি দেখলেন—তার সম্মুখে গৌড়ের রাজার বিশাল নৌবাহিনী। দেখতে দেখতে সেই নৌবাহিনী কলিঙ্গরাজের নৌবাহিনীকে ঘিরে ফেলল। তুমুল যুদ্ধ হলো। অনন্তবর্মা পরাজিত হলেন। তাঁর নৌবাহিনী নদীর জলে ডুবে গেল, বন্দী হলেন কলিঙ্গরাজ অনন্তবর্মা।

বন্দীকে আনা হলো রামাবতীর রাজ দরবারে। বন্দী অনন্তবর্মা বিস্মিত হয়ে দেখলেন—রাজ দরবারে রাজার পাশে বসে সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুক।

হেসে ফেললেন বৃদ্ধ ভিক্ষুক। বললেন, "আমায় চিনতে পারলেন কলিঙ্গরাজ?"

কুমার পাল বললেন,—"আমিই চিনিয়ে দিচ্ছি। ইনি আমার প্রধান মন্ত্রী। বৈদ্যদেব। ইনি মন্ত্রী এবং বন্ধু এবং ইনিই আমার সেনাপতি। ইনিই গৌড় রাজ্যের গৌরব।"

অনন্তবর্মা সব বুঝতে পারলেন। লজ্জায় মাথা নত করলেন।

অনুশীলনী

১. একই অর্থের শব্দ পাশাপাশি লেখো। এরজন্য বইয়ের শেষে অভিধান দেখতে পারো।

যেমন :—বিশাল—বিরাট | পরাজিত— | অনুসরণ—

স্থাপন— | মত্ত— | উদ্দীপ্ত—

প্রধান – | পিছু— | বিস্মিত—

২. রামাবতী কোন্ দেশের রাজধানী ছিল? কোন্ নদীর তীরে?

৩. যুদ্ধটি কোথায় হয়েছিল?

৪. এ যুদ্ধে কে জয়ী হয়েছিল?

৫. বৈদ্যদেব কিভাবে স্বদেশ রক্ষা করেছিলেন?

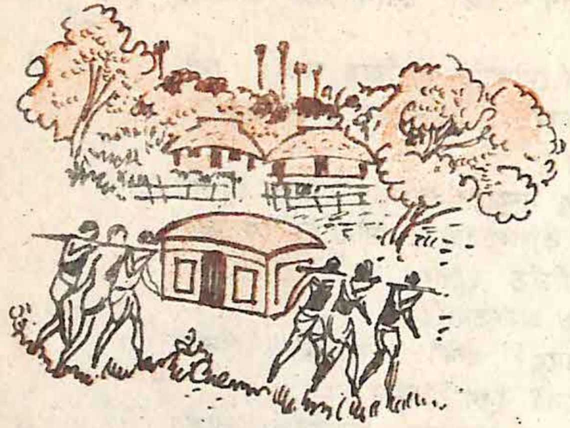
মৌখিক

১. এ যুদ্ধে কোন্ যান ব্যবহার করা হয়েছিল?

২. বর্তমানে যুদ্ধে কোন্ কোন্ যান ব্যবহার করা হয়? কয়েকটির নাম বলো।

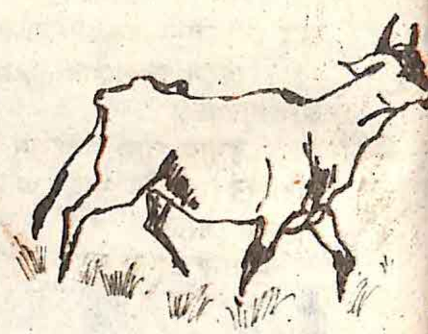
৩. স্বদেশ রক্ষার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন এমন কয়েকজন ভারতবাসীর নাম বলো।

৪. শিক্ষক মহাশয়ের কাছ থেকে দেশ-বিদেশের দেশ-প্রেমিকদের দেশপ্রেমের কাহিনী শুনে নাও।



পালকির গান

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

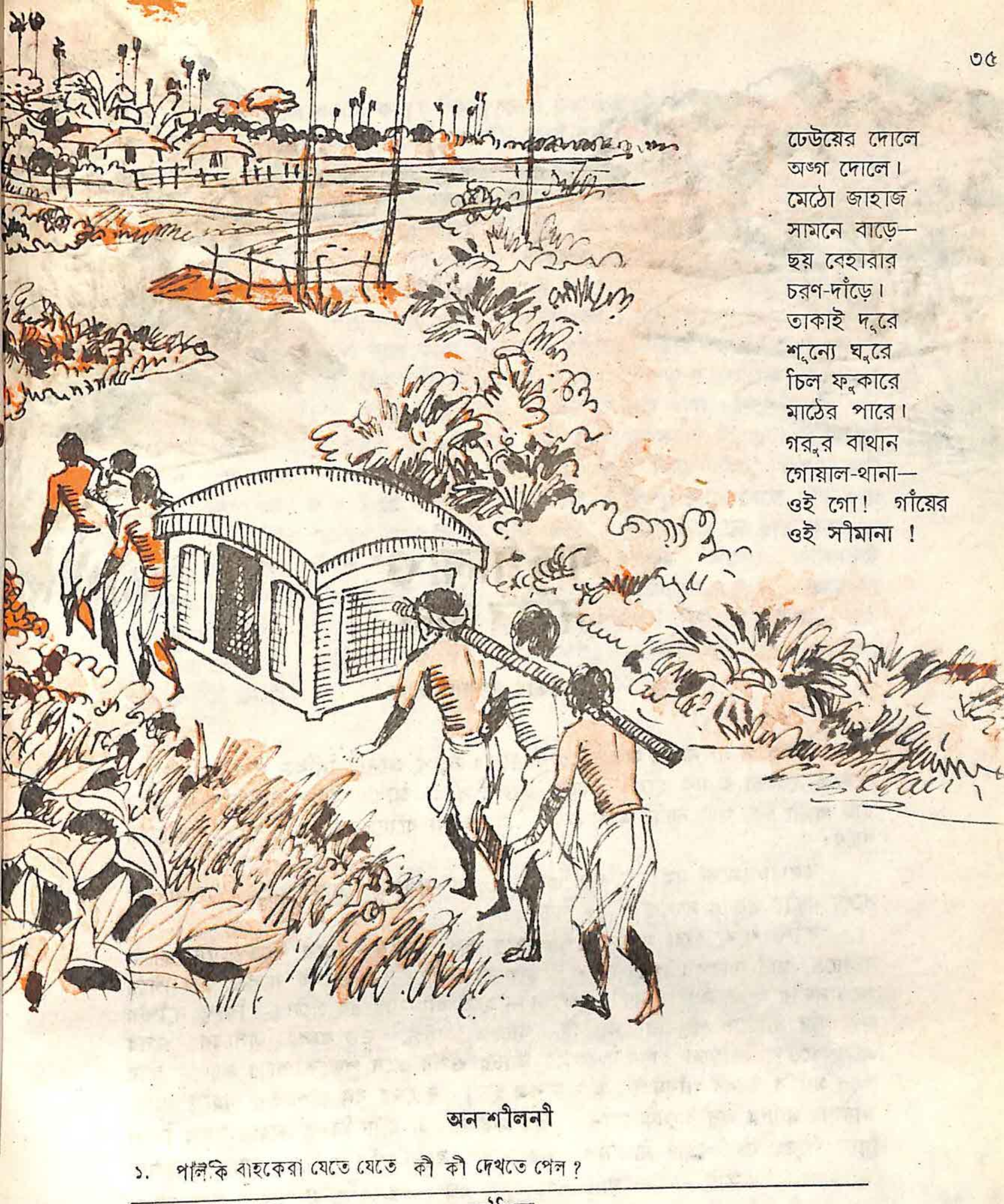


পালকি চলে !
পালকি চলে !
গগন তলে
আগুন জ্বলে !
স্তব্ধ গাঁয়ে
আদুল গায়ে
যাচ্ছে কারা
রৌদ্রে সারা !
ময়রা মুদি
চক্ষু মুদি
পাটায় বসে
ঢুলছে কসে !
দুধের চাঁছি
শুষছে মাছি—
উড়ছে কতক
ভনভনিয়ে।
আসছে কারা
হনহনিয়ে ?
হাটের শেষে
রুক্ষ বেশে
ঠিক দুপুরে
ধায় হাটুরে !
কুকুরগুলো
শুঁকছে ধুলো—
ধুঁকছে কেহ
ক্লান্ত দেহ।





ঢুকছে গোরু
দোকান ঘরে,
আমের গন্ধে
আমোদ করে।
পালকি চলে
পালকি চলে—
দুলকি চালে
নৃত্য তালে।
ছয় বেহারা—
জোয়ান তারা—
গ্রাম ছাড়িয়ে
আগ বাড়িয়ে
নামল মাঠে
তামার টাটে !
তপ্ত তামা—
যায় না থামা—
উঠছে আলে
নামছে গাড়ায়—
পালকি দোলে
ঢেউয়ের নাড়ায় !



ঢেউয়ের দোলে
অঙ্গ দোলে।
মেঠো জাহাজ
সামনে বাড়ে—
ছয় বেহারার
চরণ-দাঁড়ে।
তাকাই দূরে
শূন্যে ঘুরে
চিল ফুকারে
মাঠের পারে।
গরুর বাথান
গোয়াল-থানা—
ওই গো! গাঁয়ের
ওই সীমানা!

অনুশীলনী

১. পাল্‌কি বাহকেরা যেতে যেতে কী কী দেখতে পেল?

মৌখিক

১. কবিতাটিতে কোন্ ঋতুর বর্ণনা আছে?

২. কী করে বোঝা যায়?

৩. বিভিন্ন দলে ভাগ করে কবিতাটি আবৃত্তি করো।



গাছপালা ও নদীর জল

মনোতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

গাছ পালা নদীর জল,—এদের একের সঙ্গে অন্যের নিবিড় সম্পর্ক। কথাটা শুনলে হয়তো অবাক হবে। নদীর জলের সঙ্গে আবার গাছপালার সম্পর্ক কী? গাছ পালা তো আর নদীর মধ্যে নেই। গাছপালা রয়েছে নদীর দু-ধারে, পাহাড়ের গায়ে।

কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে গাছপালার সঙ্গে নদীর জলের সম্পর্কটা কত গভীর।

বৃষ্টি শুরু হলে মাটির ওপর দিয়ে জল গড়িয়ে গিয়ে পড়ে ছোটো ছোটো নালাতে, আর তারপর গিয়ে মেশে বড়োবড়ো নদীতে। এ ভাবেই নালার জল গিয়ে পড়ে নদীর জলে, আবার নদীর জল লীন হয়ে যায় সাগরের জলে। কিন্তু বৃষ্টির জল যদি মাটিতে পড়বার আগেই গাছের পাতা, ডালপালা এসবের ওপর এসে পড়ে? তাহলে তা খুব জোরে মাটির ওপর এসে পড়তে পারে না। তার ফলে মাটির ক্ষয়ের পরিমাণও অনেক কম হয়। কাজেই বন জঙ্গলের চাইতে ন্যাড়া জায়গায় মাটির ক্ষয় অনেক বেশি। এই ক্ষয় পাওয়া মাটি কিন্তু জলের সাথে মিশে গিয়ে পড়ছে ছোট ছোট নালানত, আর তারপর বড়ো বড়ো নদীতে। ন্যাড়া জায়গায় নদী-নালাগুলি তাই সহজেই মাটি পড়ে বুজে যায়। কখনও নুড়ি পাথরে বুজে যায়। এর ওপর খুব একচোট বৃষ্টি হয়ে গেল। এই নদীনালা বৃষ্টির সবটা জল বয়ে নিয়ে যেতে পারে না। জল তখন নদীর দুপাশের জমি জায়গা গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বন্যা আসে। কিন্তু গাছপালা থাকলে মাটির ক্ষয় কম হবে। অমন অঘটন কম ঘটবে। এই জন্য মানুষ ঋণী থাকে গাছপালার কাছে।

এ-তো গেল বন্যার কথা। কিন্তু খরার কথাও একটু ভাবা দরকার। খরায় নদী-নালা কুয়ো সব শুকিয়ে যায়, চাষের জমি ফেটে যায়। মানুষ হাহাকার শুরু করে এক ফোঁটা জলের জন্য। কিন্তু কেন এমন হয়? তার কারণও সেই গাছপালার অভাব। মাটি বৃষ্টিকে ধরে রাখতে না পারলে সে জল তো নদী নালা বেয়ে গড়িয়ে সাগরেই চলে যাবে। তাছাড়া গরমে অনেকটা জল তো বাষ্প হয়ে হাওয়ার সঙ্গে মিশে যাবে। মাটি শুকনো হয়ে পড়বে। তাহলে এভাবে মাটিকে শুকিয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কি দরকার? সেই গাছপালা। গাছপালাই বৃষ্টির জল ধরে রাখতে পারে। গাছপালাই মাটিকে ঠান্ডা রাখতে পারে।

আর একটা কথাও বলে রাখা ভালো। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই জলের ধারা গড়িয়ে যেতে চায় নীচের দিকে, নালার দিকে। কিন্তু গাছপালার মধ্যে জল খুব তাড়াতাড়ি গড়িয়ে যেতে পারে না। গাছের শেকড়ে বাধা পায়। তখন ওই জলের কিছুটা অংশ মাটিতে ঢুকে যায়। এটা কি লোকসান? না, প্রায় পুরোটাই লাভের খাতায় জমা পড়লো। এই জল মাটির নীচে গিয়ে একটু একটু করে মাটির দানাগুলির ফাঁক দিয়ে নীচের দিকে যায়। কিন্তু যেতে যেতে যদি বাধা পায়? তখন ক্রমে পাশের দিকে চলতে শুরু করে। তারপর কোনো ঢালু জায়গায় মাটির গা বেয়ে বেরিয়ে নালায় এসে মেশে। বৃষ্টির জলের অনেকটাই এভাবে ধীরে ধীরে মাটির নীচে দিয়ে বয়ে এসে নদী ও নালায় পড়ে। অনেকটা জায়গা গাছপালা জঙ্গলে ঢাকা থাকলে সে সব জায়গার নদীও নালাগুলিতে তাই সারা বছরই একটু আধটু জল থেকেই যায়—একেবারে শুকিয়ে যায় না। মানুষের প্রাণও তাই বেঁচে যায়।



এসব কথা ভেবে দেখলে মনে হয়,—গাছপালাই মানুষকে জল দিচ্ছে, গাছপালাই মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। গাছপালা না থাকলে গোটা দেশটা মরুভূমি হয়ে যেত।

গাছপালা তো মানুষের জন্য এত করছে। আর মানুষের কি কোনো কর্তব্য নেই গাছপালার প্রতি? আছে বইকি ! মানুষ পারে গাছপালাকে বাঁচিয়ে রাখতে ; চারাগাছ পুঁতে গাছের সংখ্যা বাড়াতে। গাছের সংখ্যা বাড়লে তাতে মানুষেরই প্রাণ বাঁচবে। আমাদের দেশটি সবুজে সবুজ হয়ে উঠবে। দেশের চেহারাই বদলে যাবে।



অনুশীলনী

১. বন্ধনীর শব্দগুলোর বদলে একই অর্থের শব্দ এই রচনা থেকে বেছে নিয়ে বসাও।
নদীর সঙ্গে মানুষের (গভীর) সম্পর্ক। কথাটা শুনলে (বিস্মিত) হতে হয়।
নদীর জল না থাকলে চারদিকে (আর্তনাদ) পড়ে যায়। নদী ও গাছ দেশের (আকৃতি) (পরিবর্তন করে) দিতে পারে।

২. খরায় কী অসুবিধা হয় ?

৩. গাছপালা থাকার কী সুবিধে ?

৪. গাছের সংখ্যা বাড়লে মানুষের কি উপকার হবে ?

৫. তোমার পরিচিত একটি গাছ সম্বন্ধে পাঁচটি বাক্য লেখো।

মৌখিক

১. বৃষ্টির জল কোথায় গিয়ে পড়ে ?

২. নদীর জল শেষ পর্যন্ত কোথায় যায় ?

৩. মাটির ক্ষয় কমবে কী করে ?

৪. তোমার পরিচিত পাঁচটি গাছের নাম বলো।

প্রদীপের বন্ধুরা



প্রদীপের পড়ার ঘর। ঘরের দেয়ালে ভারতের মানচিত্র। মানচিত্রটির দিকে তাকাতেই প্রদীপের চোখে ভেসে ওঠে একটি উৎসবের ছবি।

সেবার কলকাতায় শিশু উৎসব হয়ে গেল। নানা জায়গা থেকে ছেলেমেয়েরা এসেছিল। দিল্লী, কাশ্মীর, রাজস্থান, আসাম, বোম্বাই, কেরল—এক একটি রাজ্যের এক একটি দল। উৎসব প্রাঙ্গণে বিরাট এক মঞ্চ। মঞ্চের পেছনে ভারতের বিশাল এক মানচিত্র। তাতে আঁকা ছিল যত রাজ্যের ছেলেমেয়ের ছবি।

পর্দা উঠলে দেখা গেল তাদের। পরনে নিজেদের অঞ্চলের পোশাক। তারা নাচল, গাইল, আবৃত্তি করল, অভিনয় করল। আনন্দে ভরে উঠল সকলের মন।

পশ্চিমবঙ্গের শিশুদের দলে ছিল প্রদীপ। ধুতি পাঞ্জাবিতে ছোট্ট প্রদীপকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। উৎসবে কত জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল তার। তার একটি ছোটো খাতা আছে। নানা রাজ্যের বন্ধুরা তাদের নাম আর ঠিকানা লিখে দিয়েছে পাতায় পাতায়। প্রদীপ খাতাটি খুলল। খাতা খুলতেই মনে পড়ে গেল বন্ধুদের কথা।

প্রথম পাতাতেই প্রেমনাথের নাম। ওদের বাড়ি দিল্লী। প্রেমনাথ বলেছিল—ছুটিতে চলে এসো আমাদের বাড়ি। বাবার সঙ্গে আমি তোমাকে দিল্লী ঘুরে দেখাব। সকালে উঠে চাপাটি খেয়ে বেরিয়ে পড়ব আমরা।

—চাপাটি?

—তোমরা ভাত খাও। আমরা চাপাটি খাই।

—দিল্লীতে অনেক কিছু দেখার আছে? না?

অনেক কিছু। রাষ্ট্রপতি ভবন, পার্লামেন্ট হাউস, ইণ্ডিয়া গেট, যন্তরমন্তর, কুতুব মিনার। নতুন দিল্লীর ছায়া ভরা রাজপথ দেখলে তোমার চোখ জুড়িয়ে যাবে।

—পুরনো দিল্লীও আছে নাকি?

—নেই আবার? বিখ্যাত লাল কেল্লা তো পুরনো দিল্লীতে।

প্রদীপ বলেছিল—গরমের ছুটিতে যাব। বাবাকে বলব।

প্রেমনাথ বলেছিল—গরমের ছুটিতে এসো না। তখন দিল্লীতে ভীষণ গরম। পুজোর ছুটিতে এসো।

পরের পাতায় মমতাজের নাম। কাশ্মীরী দলের মমতাজ। নৌকা নাচে সে মাঝি হয়েছিল। কাশ্মীরে বাড়ি। তাদের অনেকগুলো ভেড়া আছে। ওর মা ভেড়ার লোম থেকে পশম তৈরি করেন। মমতাজ পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে মা'র কাজে সাহায্য করে। ওর বাবা একটি হাউজ বোট দেখাশোনা করেন।

হাউজ বোট—কথাটা প্রথম শুনলো প্রদীপ।

মমতাজ বুঝিয়ে দিল। হাউজ বোট মানে নৌকাবাড়ি। হ্রদের জলে ভেসে থাকে সুসজ্জিত নৌকা। নৌকাতেই রান্নাবান্না। নৌকাতেই থাকার জায়গা।

—ভারি মজা তো!

—ভারি মজা। কাশ্মীরে অনেক পর্যটক বেড়াতে যায়। অনেকে দুচারদিন নৌকাবাড়িতে কাটিয়ে দেয়।

মমতাজ প্রদীপকে বলল—তুমি চলোনা কাশ্মীরে। দেখবে পাহাড়ের গায়ে গায়ে কত ফুল। কত গাছ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। কাশ্মীরে এলে তুমি অনেক আপেল খেতে পাবে।

মমতাজের ফর্সা টুকটুকে মুখের দিকে তাকিয়ে প্রদীপ বলেছিল—যাব।

মনে পড়ে যায় প্রতাপকে। রাজস্থানী দলের প্রতাপ। ভারি ছটফটে। মাথায় পাগড়ি বেঁধে মঞ্চে এসেছিল। যোধপুরের একটি গ্রামে থাকে ওরা। ওদের বাড়িতে উট আছে। প্রতাপ উটে চড়েছে।

উটের নাম শুনে প্রদীপের কৌতূহল হলো।

প্রতাপ বলেছিল—আমাদের যোধপুরের একটু দূরেই থর। থর মরুভূমি। ওখানে লোকেরা উটে চড়েই যাতায়াত করে। উট হল মরুভূমির জাহাজ। তুমি যোধপুরে এসো। তোমায় উটে চড়াবো।

একটি পাতায় রামনের নাম। রামন ছিল কেরলের দলে। ওর বাবার সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যবসা।

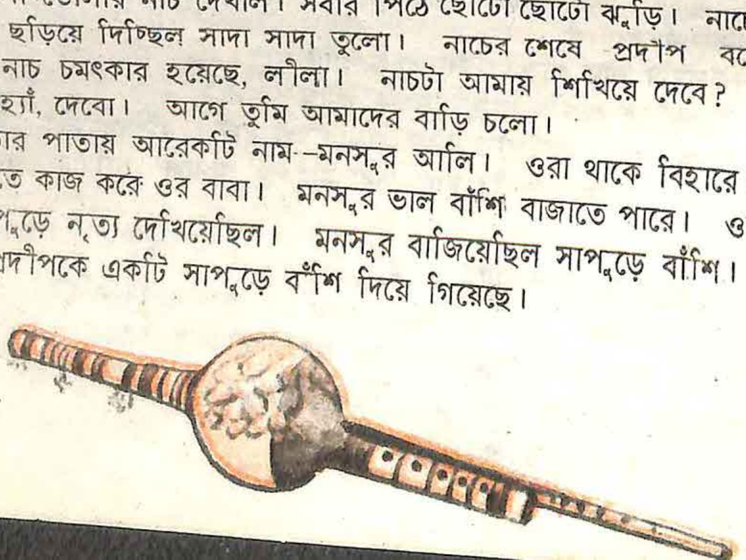
—তুমি মাছ ধরতে পার?

—দু একবার বাবার সঙ্গে নৌকায় করে গিয়েছি। সমুদ্রের ঢেউ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।

রামন পেন্সিল দিয়ে এঁকে দিয়েছে তাদের বাড়ির ছবি। বাড়ির চারদিকে নারকেল গাছ। একটু দূরেই দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের জল। বাড়ি থেকে দেখা যায় সমুদ্রে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত। রামন বার বার করে প্রদীপকে তাদের বাড়ি যেতে বলেছে।

লীলারা থাকে অন্ধ্রে। ওদের ওখানে তুলোর চাষ হয় খুব। লীলাদের দল উৎসবে তুলো তোলার নাচ দেখাল। সবার পিঠে ছোটো ছোটো ঝুড়ি। নাচের মাঝে মাঝে মঞ্চে ছড়িয়ে দিচ্ছিল সাদা সাদা তুলো। নাচের শেষে প্রদীপ বলেছিল—তোমাদের নাচ চমৎকার হয়েছে, লীলা। নাচটা আমায় শিখিয়ে দেবে? লীলা বলেছিল—হ্যাঁ, দেবো। আগে তুমি আমাদের বাড়ি চলো।

খাতার পাতায় আরেকটি নাম—মনসুর আলি। ওরা থাকে বিহারে। ঝরিয়া কয়লাখনিতে কাজ করে ওর বাবা। মনসুর ভাল বাঁশি বাজাতে পারে। ওদের দল একটি সাপুড়ে নৃত্য দেখিয়েছিল। মনসুর বাজিয়েছিল সাপুড়ে বাঁশি। যাবার সময় সে প্রদীপকে একটি সাপুড়ে বাঁশি দিয়ে গিয়েছে।



জয়মঙ্গলকে মনে আছে প্রদীপের। আসামের দলের জয়মঙ্গল। সবাই ডাকে জয়। আসামের একটি চা বাগানে ওদের বাড়ি। ও প্রদীপকে বলেছিল চা বাগানের কথা। পাহাড়ের গায়ে গায়ে সবুজ চা গাছ। ছবির মতো সুন্দর। জয়মঙ্গলরা নেচেছিল বিহু নাচ। বিহু ওদের বড়ো উৎসব। উৎসবের শেষ গানটি ছিল সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত। প্রায় দুশো ছেলেমেয়ে একসঙ্গে গাইল সেই গান।। দর্শকেরাও গলা মেলাল তাদের সঙ্গে। সেই দৃশ্য প্রদীপ কখনো ভুলবে না।

যাবার সময় বন্ধুরা তাকে নানা জিনিষ উপহার দিয়েছে। প্রদীপ দিয়েছে একটি করে বাঁকুড়ার পুতুল ঘোড়া। ঘোড়ার গলায় বাঁধা এক টুকরো কাগজ। তাতে লেখা আছে—বন্ধুকে দিলাম। প্রদীপ।



অনুশীলনী

১. লেখাটি থেকে শূন্য স্থানে একটি করে উপযুক্ত শব্দ বসাও :
—উৎসব, —প্রাঙ্গণ, —সুন্দর, —ভবন, —কেল্লা, —গরম, —নৌকা—, ——জাহাজ, —ঢেউ, —পুতুল

২. বন্ধনীর শব্দগুলো নীচের শূন্যস্থানে বসিয়ে একটি অনুষ্ঠানের বর্ণনা লেখো :
(শিশু দিবস, অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠানে, যোগদান, উদ্বোধন-সঙ্গীত, সাপুড়ে নৃত্য, শিশুশিল্পী, ভাটিয়ালি গানের, হাস্য-কৌতুক, মজার, আবৃত্তি, সমবেত কণ্ঠে) —উপলক্ষে সেদিন আমরা একটি—করেছিলাম। —অনেক ছেলেমেয়ে— করেছিল। প্রথমে—হল। তারপর হল একটি—। একজন—বাঁশি বাজিয়েছিল। —সঙ্গে নেচেছিল একদল মেয়ে। দুটি ছেলের—ভারি—হয়েছিল। নজরুলের কবিতা— করে চারজন ছেলেমেয়ে। সবশেষে হয়েছিল—সমাপ্তি-সঙ্গীত।

৩. পাশের গ্রামে, বা শহরে অথবা অন্য কোথাও গিয়ে একটি বন্ধুর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে। তার সম্বন্ধে কম করে পাঁচটি বাক্য লেখো।

মৌখিক

১. এগুলো কোথায় গেলে দেখা যাবে বলো :
হাউস-বোট, সমুদ্রে সূর্যোদয়, যন্তর-মন্তর, চাবাগান, কয়লাখনি, উট।

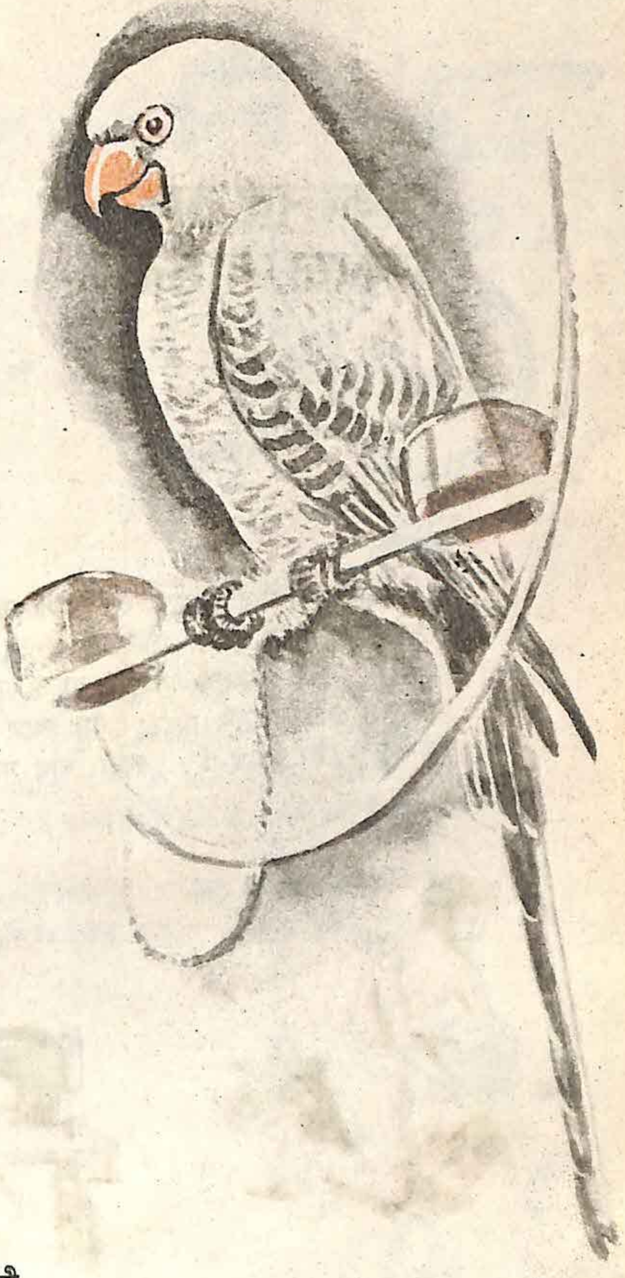


সমব্যথী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম কুকুর-ছানা
তবে পাছে তোমার পাতে
আমি মুখ দিতে যাই ভাতে
তুমি করতে আমায় মানা?
  সত্যি করে বল্,
আমায় করিস নে, মা, ছল—
  বলতে আমায় 'দূর দূর দূর
  কোথা থেকে এল এই কুকুর'?
  যা মা, তবে যা মা,
আমায় কোলের থেকে নামা।
আমি খাব না তোর হাতে,
আমি খাব না তোর পাতে॥





যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম তোমার টিয়ে
তবে পাছে যাই, মা, উড়ে
আমায় রাখতে শিকল দিয়ে?
সত্যি ক'রে বল্,
আমায় করিস নে, মা, ছল—
বলতে আমায় 'হতভাগা পাখি,
শিকল কেটে দিতে চায় রে ফাঁকি'?
তবে নামিয়ে দে মা,
আমায় ভালোবাসিস নে মা।
আমি রব না তোর কোলে,
আমি বনেই যাব চলে॥

অনুশীলনী

১. মিল দাও

একযে ছিল টিয়ে।	এমনি ভালো পাখি—
ভোরের বেলা অনেক কথা	তাইতো খাঁচা দিলাম খুলে
কইত সে শিস—।	ভুল করেছি— ?

মৌখিক

১. কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাও।

সকলের তরে সকলে আমরা



জন্মাবার পর মানুষ কত অসহায় অবস্থায় থাকে। সে হাঁটতে পারে না। কেউ হাত ধরে তাকে হাঁটতে শিখিয়ে দেন। খিদে পেলে মা ঠিক সময় খাইয়ে দেন। ঠাণ্ডা লাগলে তিনিই তা বুঝতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গায়ে কাপড় চোপড় জড়িয়ে দেন। বড়ো হবার পথে প্রতি পদে মানুষের অপরের সাহায্য দরকার। মা বাবা তো আছেনই। দাদা দিদি সবাই সাহায্য করেন।

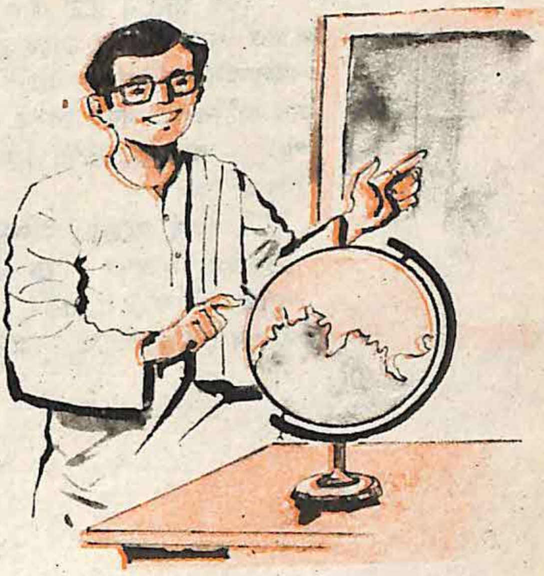






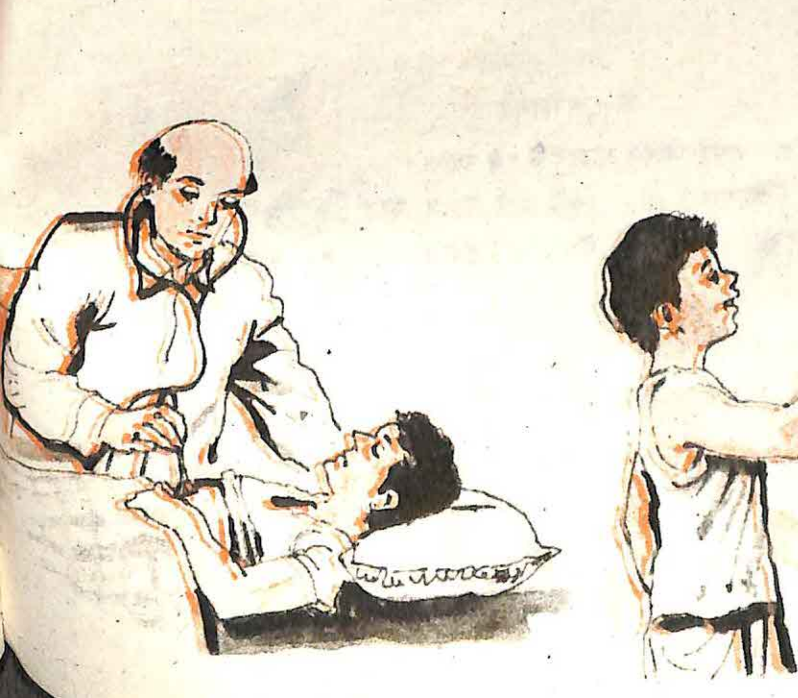
বড়ো হলে বন্ধুরা সাহায্য করে। প্রতিবেশীরা সাহায্য করে। সবার সাহায্য নিয়ে সবাই বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য চাই খাদ্য। কৃষকরাই এই খাদ্য উৎপাদন করে। পরবার জন্য জামাকাপড় চাই। তাঁতে, মেশিনে শ্রমিকরা এই কাপড় তৈরি করে। বসবাস করবার জন্য বাড়ি ঘর চাই। কাঁচা বাড়ি তৈরি করে ঘরামি, দিনমজুর। পাকা বা ইঁটের বাড়ি তৈরি করে রাজমিস্ত্রি আবার এসবের জন্য মালমশলা তৈরি করে দেয় নানা শ্রমিক নানা ভাবে। তৈরি হচ্ছে ইঁট, সিমেন্ট, ইস্পাত, পাইপ, লোহার নানা জিনিষপত্র, ইলেকট্রিকের জিনিষপত্র।





কাঁচা বাড়ি হলেও তা তৈরির জন্য বাঁশ, খড়, দড়ি, মাটির যোগান দিচ্ছে কত লোক। আমাদের যাতায়াতের রাস্তা তৈরি করছে শত শত শ্রমিক মিলে। সকলে মিলে সেই রাস্তায় হাঁটছি। শিক্ষক ছাত্রদের পড়িয়ে মানুষ করছেন। ডাক্তার চিকিৎসা করে রোগ সারিয়ে দিচ্ছেন। ডাকঘর থেকে কত লোকের চেষ্টায় চিঠিপত্র আসছে যাচ্ছে। এইভাবে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মানুষ মানুষকে সাহায্য করে চলেছে।

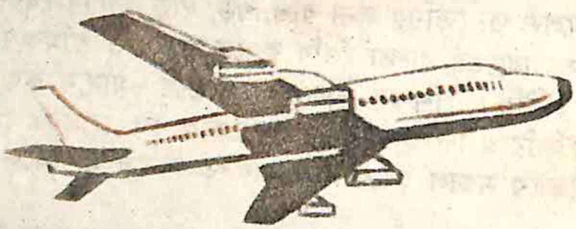
একে অপরকে সাহায্য করার জন্য মানুষ একত্র হয়েছে। তারা সমাজ গড়েছে। এই সমাজকে আবার সকলের জন্য সুখী সমাজে পরিণত করতে মানুষ কতই না লড়ছে।





যত মানুষ তত কাজ। সমাজের সব মানুষ এক কাজ করে না। প্রত্যেকে পৃথক পৃথক কাজ বেছে নেয়। এইভাবে কাজ বেছে নেওয়াকে বলে জীবিকা অবলম্বন। তোমরাও বড়ো হলে এক একজন এক একটা জীবিকা অবলম্বন করবে। সব জীবিকার ধরণ কিন্তু এক নয়। আকাশে যে বিমান চালায় তার বিপদ পদে পদে। আবার গভীর সমুদ্রে যারা মাছ ধরে, খনিতে যারা কাজ করে তাদেরই কি বিপদ কম।

এসব সত্ত্বেও কিন্তু আমরা একে অপরকে সাহায্য করে চলেছি। আমরা এইভাবে নিজেরা বেঁচে থাকি এবং অপরকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করি। এই পৃথিবীটা কত সুন্দর। কত সম্পদ রয়েছে পৃথিবীতে। আমরা সকলে মিলে এই সম্পদ ভোগ করতে পারলে কতই না সুখে থাকতে পারি!



অনুশীলনী

১. বন্ধনীর শব্দগুলোর বদলে একই অর্থের আরেকটি শব্দ বসাও :

মানুষ আজ আর (অসহায়) নয়। কেউ কষ্টে পড়লে তার (প্রতিবেশী) রা এগিয়ে আসে। মানুষ নিজের খাদ্য নিজে (উৎপাদন) করতে পারে। সব মানুষের (জীবিকা) এক নয়।

২. কে কী ভাবে মানুষকে সাহায্য করেন ?

মা, কৃষক, রাজমিস্ত্র. শিক্ষক, ডাক্তার

৩. খেলতে গিয়ে তোমার বন্ধুর পা কেটে গেল। তুমি কী ভাবে তাকে সাহায্য করবে ? এ সম্বন্ধে পাঁচটি বাক্য লেখো।

মৌখিক

১. বড় হয়ে তুমি কী হাতে চাও ? কেন তা হতে চাও ?



চড়ুইটি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

চড়ুই, চড়ুই চড়ুইটি
ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ ওড়ে
কড়িকাঠের ফোকর থেকে
বেরিয়ে সে কোন ভোরে।
কিচির মিচির বলে কী?
ইচ্ছে করে শিখে নি।
কেমন করে পারি!
ইংরিজি কি বাংলা থেকেও
শক্ত আরো ভারি।
চড়ুই, চড়ুই চড়ুইটি
উঠোন খুঁটে খায়।
ভুলো মেনির দেখা পেলে-ই
কোথায় উড়ে যায়।
কোথায় যে যায় জানি কি!
ইচ্ছে করে সঙ্গ নি।
কেমন করে যাই!
মার যে মানা, উঠোন খানার
বাইরে যেতে নাই।







চড়ুই. চড়ুই চড়ুইটি
আমায় চেনে কই!
দিনরাত্তির দুজনে তবু
এক বাড়িতে-ই রই।
বাসায় ঢুকে করে কী?
ইচ্ছে করে দেখে নি।
কেমন করে উঠি?
বড্ড উঁচু. কাছেপিঠে
নেই মই কি খুঁটি।

অনুশীলনী

১. এই পাখিটি সম্বন্ধে পাঁচটি বাক্য লেখো।

মৌখিক

১. শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের এই কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।

আবদুল মাঝির গল্প

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



আবদুল মাঝি, ছুঁচলো তার দাড়ি, গোঁফ তার কামানো, মাথা তার নেড়া। তাকে চিনি, সে দাদাকে এনে দিত পদ্মা থেকে ইলিশ মাছ, আর কচ্ছপের ডিম। সে আমার কাছে গল্প করেছিল—একদিন চত্তির মাসের শেষে ডিঙিতে মাছ ধরতে গিয়েছে, হঠাৎ এল কালবৈশাখী। ভীষণ তুফান, নৌকো ডোবে ডোবে। আবদুল দাঁতে রশি কামড়ে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, সাঁৎরে উঠল চরে, কাছি ধরে টেনে তুলল তার ডিঙি।

গল্পটা এত শিগ্‌গির শেষ হল, আমার পছন্দ হল না। নৌকোটা ডুবল না, অমনিই বেঁচে গেল, এতো গপ্‌পই নয়। বার বার বলতে লাগলুম, 'তার পর'? সে বললে, 'তারপর সে এক কাণ্ড। দেখি এক নেকড়ে বাঘ। ইয়া তার গোঁফ-জোড়া। ঝড়ের সময়ে সে উঠেছিল ওপারে গঞ্জের ঘাটের পাকুড় গাছে। দমকা হাওয়া যেমনি লাগল গাছ পড়ল ভেঙে পদ্মায়। বাঘ ভায়া ভেসে যায় জলের তোড়ে। খাবি খেতে খেতে উঠল এসে চরে। তাকে দেখেই আমার রশিতে লাগালুম ফাঁস। জানোয়ারটা এত্তো বড়ো চোখ পাকিয়ে দাঁড়াল আমার সামনে। সাঁতার কেটে তার জমে উঠেছে খিদে। আমাকে দেখে তার লাল টক্‌টকে জিভ দিয়ে নাল ঝরতে লাগল। বাইরে ভিতরে অনেক মানুষের সঙ্গে তার চেনা-শোনা হয়ে গেছে, কিন্তু আবদুলকে সে চেনে না। আমি ডাক দিলুম, 'আও বাচ্ছা'! সে সামনের দু পা তুলে উঠতেই দিলুম তার গলায় ফাঁস আটকিয়ে, ছাড়াবার জন্য যতই ছট্‌ফট্‌ করে ততই ফাঁস এঁটে গিয়ে তার জিভ বেরিয়ে পড়ে।

এই পর্যন্ত শুনেই আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'আবদুল, 'সে মরে গেল নাকি'? আবদুল বললে, 'মরবে তার বাপের সাধ্যি কী? নদীতে বান এসেছে, বাহাদুরগঞ্জে ফিরতে হবে তো? ডিঙির সঙ্গে জুড়ে বাঘের বাচ্ছাকে দিয়ে গুণ টানিয়ে নিলেম অন্তত বিশ ক্রোশ রাস্তা। গোঁ গোঁ করতে থাকে, পেটে দিই দাঁড়ের খোঁচা, দশ পনেরো ঘণ্টার রাস্তা দেড় ঘণ্টায় পৌঁছিয়ে দিলে। তার পরেকার কথা আর জিগ্‌গেস কোরো না বাবা, জবাব মিলবে না'।



আমি বললুম, আচ্ছা, বেশ, বাঘ তো হল, এবার কুমীর'? আবদুল বললে, জলের উপর তার নাকের ডগা দেখেছি অনেকবার। নদীর ঢালু ডাঙায় লম্বা হয়ে শুয়ে সে যখন রোদ পোহায়, মনে হয়, ভারি বিচ্ছিরি হাসি হাসছে। বন্দুক থাকলে মোকাবিলা করা যেত। লাইসেন্স ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু মজা হল। একদিন কাঁচি বেদেনি ডাঙায় বসে দা দিয়ে বাখারি চাঁচছে, তার ছাগলছানা পাশে বাঁধা। কখন নদীর থেকে উঠে কুমীরটা পাঠার ঠ্যাঙ ধরে জলে টেনে নিয়ে চলল। বেদেনি একেবারে লাফ দিয়ে বসল তার পিঠের উপর। দা দিয়ে ওই দানো গিরগিটির গলায় পোঁচের উপর পোঁচ লাগাল। ছাগলছানা ছেড়ে জন্তুটা ডুবে পড়ল জলে'।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, তার পরে? আবদুল বললে, তার পরেকার খবর তলিয়ে গেছে জলের তলায়, তুলে আনতে দেরি হবে।'

অনুশীলনী

১. গল্পটি পড়ে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

॥ বাঘের গুন টানা ॥

একদিন আবদুল মাঝি ——। হঠাৎ এল ——। ভীষণ ——। নৌকা ——।
আবদুল দাঁতে ——। সাঁৎরে ——। কাছি ধরে ——।
—— নেকড়ে বাঘ। বাঘটি খাবি খেতে খেতে উঠে এল ——।
আবদুল রশিতে —— লাগাল। তারপর তার গলায় —— আটকে দিল।
এভাবে সে বাঘকে দিয়ে —— রাস্তা।

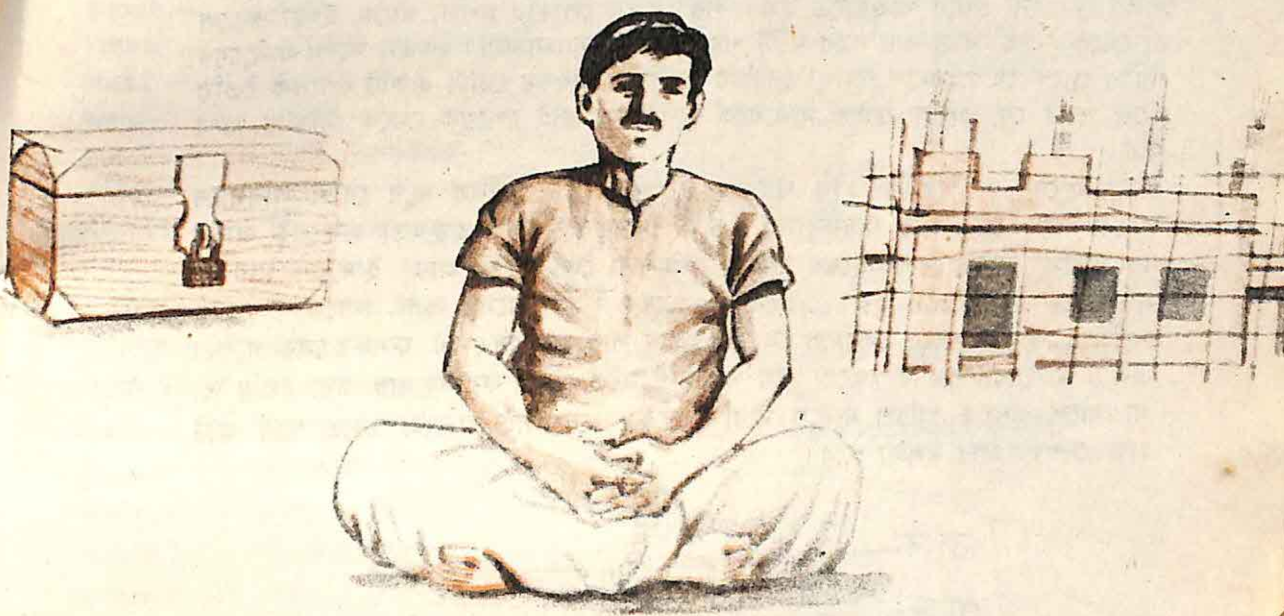
২. আবদুল মাঝি দাদাকে কী কী জিনিস এনে দিত?
৩. আবদুল মাঝির চেহারা কেমন ছিল?
৪. কাঁচি বেদেনি কুমীরের মুখ থেকে ছাগলছানা কীভাবে রক্ষা করেছিল লেখো।
৫. বাঁদরনাচ তোমরা দেখেছ। একটি বাঁদরনাচের গল্প লেখো।

মৌখিক

১. কোন্ কোন্ পশু কী ভাবে মানুষের কাজে লাগে?
গরু, ঘোড়া, উট, ছাগল, হাতি

শরীরের মালমশলা

সুকুমার রায়



এখানে একটা বাক্স আছে। বাক্সটা কাঠের তৈরি। শুধু কাঠ ? না, তাতে লোহার কব্জা আর তালা, আর চারধারে পিতলের কাজ আছে। আর কী আছে ? আর তার গায়ে চকচকে গালা বার্নিশ আছে। সামনে ঐ একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। কী দিয়ে তৈরি হচ্ছে ? ইঁট কাঠ লোহা চুন সুরকি বালি সিমেণ্ট রং তেল, এইরকম সব জিনিস। এই সমস্ত হল তার মালমশলা। যারা বাড়ি বানায় তারা হিসাব করে বলতে পারবে, এতে অমুক জিনিস এতখানি আন্দাজ লেগেছে—তার বাজার দাম এত। আচ্ছা—সামনে একটা মানুষ বসে আছে—বল ত কিসের তৈরি মানুষ ? কিসের তৈরি, তার একটু নমুনা শুনবে ?

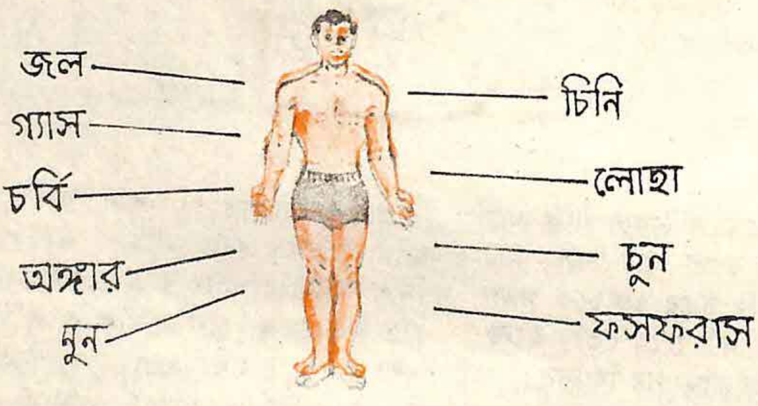
দু মণ ওজনের একটি মানুষের শরীরের মধ্যে হিসাব করলে একমণ জল পাওয়া যাবে—বেশ বড়ো বড়ো তিন-চার কলসী জল। তার শরীরে যতরকম গ্যাস বাষ্প বা বাতাস আছে তা যদি আলগা করে বার করতে চাও, তা হলে এত গ্যাস বেরোতে পারে যে তার জন্য ১২ হাত লম্বা ১২ হাত চওড়া ৮ হাত উঁচু একটা ঘর লাগবে। তার মধ্যে এমন অনেকখানি গ্যাস পাবে বাজারে যার দাম আছে—বিক্রি করতে পারলে প্রায় টাকা দশেক পাওয়া যায়।

ঐ ওজনের একজন সাধারণ মানুষের গায়ে যত চর্বি আছে তা দিয়ে এক পোয়া ওজনের প্রায় গোটা ত্রিশেক মোমবাতি তৈরি হতে পারে। তা ছাড়া খাঁটি অঙ্গার বা মূল কয়লা এত পাওয়া যাবে যে তা দিয়ে দশ হাজার পেন্সিলের সীস তৈরি হতে পারে। বারো সের পাথুরে কয়লার মধ্যেও অতখানি অঙ্গার থাকে না

খোঁজ করলে একটা শরীরের মধ্যে থেকে প্রায় কুড়ি চামচ নুন আর দু-তিন মুঠো চিনি অনায়াসেই বার করা যেতে পারে।

যে সমস্ত জিনিস না হলে শরীর টিকতে পারে না তার একটি হচ্ছে লোহা। এই যে রক্তের রং দেখছ, টকটকে লাল, শরীরে লোহা কম পড়লেই সে রং ফ্যাকাসে হয়ে যায়, মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে, কঠিন ব্যারাম দেখা দেয়। তখন মানুষকে লোহা মেশানো ওষুধ খাওয়াতে হয়। শরীরে যে লোহার মশলা থাকে, ইচ্ছা করলে তা থেকে লোহা ধাতু বার করে খাঁটি শক্ত লোহা বানানো যায়। একজন সুস্থ মানুষের শরীর থেকে যে পরিমাণ লোহা বেরোয় তা দিয়ে এরকম মোটা একটি পেরেক তৈরি হতে পারে যে, একটা আস্ত মানুষকে অনায়াসে সেই পেরেক থেকে টাঙিয়ে রাখা যায়।

মানুষের শরীরে যে হাড় থাকে তা থেকে দুটি জিনিস খুব বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়—চুন আর ফসফরাস। চুন দিয়ে কত কাজ হয়, তা সকলেই জান। ফস্‌ফরাস্‌ দিয়ে দেশলাইয়ের জ্বালানি মশলা তৈরি হয়, আর ইঁদুর মারবার সাংঘাতিক বিষ তৈরি হয়। অনেক ওষুধেও ফস্‌ফরাসের ভাগ থাকে। হাড় পুড়িয়ে জমির সঙ্গে মেশালে যে চমৎকার সার হয় সেও ঐ ফসফরাসের গুণে। একটি মানুষের শরীর থেকে যে পরিমাণ খাঁটি ফস্‌ফরাস্‌ বার করা যায় তা খাওয়ালে অন্তত পাঁচশ মানুষ মারা পড়বে। দেশলাই বানালে তাতে প্রায় আট লক্ষ দেশলাইয়ের মশলা হবে।



অনুশীলনী

১. বন্ধনী থেকে বিপরীত অর্থের শব্দগুলো বেছে নিয়ে ঠিক জায়গায় লেখো :

(শক্ত, বেশি, সবল, নীচু, পেছনে, সরু, বিশেষ,)

সামনে—, আলগা—, উচুঁ—, সাধারণ—, কম—, মোটা—, দুর্বল—।

২. মানুষের শরীরে কী কী পাওয়া যায় ?

৩. লোহা কম পড়লে শরীরের কী কী ক্ষতি হবে ?

৪. তোমার শরীরের নাক, চোখ, হাত, পা, কান, মুখ, দাঁত-এর কী কী কাজ লেখো।

মৌখিক

১. কাঠের বাক্স তৈরি করতে কী কী জিনিস লাগে ?

২. একটি বাড়ি তৈরি করতে কী কী জিনিস লাগে ?

শব্দসূচি

[অভিধান]

অ

অক্ষম— দুর্বল
অগ্রগতি— উন্নতি
অগ্রসর আগুয়ান, সামনে-যাওয়া
অঘটন— দুর্ঘটনা
অঙ্গার— কয়লা
অদ্ভুত— মজার, বিস্ময়কর
অনায়াসে— সহজে
অনুসরণ— পিছু ধাওয়া, অনুগমন
অন্তত— কমসেকম, কম করে
অপরূপ— খুব সুন্দর, অপূর্ব
অবলম্বন— আশ্রয়
অবহেলে— সহজে, অনায়াসে
অবাক— বিস্মিত
অত্যন্ত— খুব বেশি
অশান্ত— দুরন্ত
অসতর্ক— অসাবধান
অসহায়— দুর্বল
অসাড়— অবশ
অস্থির— চঞ্চল

আ

আকুল— অস্থির, চঞ্চল
আগ— সম্মুখ
আড়ালে— গোপনে, আড়ে
আড়ে— আড়ালে
আঁৎকে— ভয়ে চমকে
আদিম— খুব পুরানো
আদুল— খোলা, আঢাকা
আমোদ— আনন্দ, ফুর্তি, আহ্লাদ
আন্দাজ— অনুমান
আলে— জমির বাঁধে
আলগা— ঢিলা, খোলা, আলাদা
আশমান— আকাশ
আস্ত— গোটা
আহবান— ডাক, নিমন্ত্রণ

উ

উৎপাদন— সৃষ্টি, তৈরি
উদরসাৎ— খাওয়া, ভোজন
উদ্দীপ্ত— খুশি, উত্তেজিত
উপাধি— পদবী

এ

একগুঁয়ে— অবাধ্য
এন্তো— খুব

ক

কঠিন— শক্ত
কড়িকাঠ— ঘরের ছাদ ধরে রাখবার কাঠ
কভু— কখনও
কর্তব্য— করার মতো কাজ, করণীয়
কর্ম— কাজ
কলেবর— শরীর, দেহ
কষ্টেসৃষ্টে— বহুকষ্টে
কাছেপিঠে— কাছাকাছি
কাবার— খতম, শেষ
কাস্তে— ফসল কাটবার অস্ত্র
কূলে— তীরে
কৌতূহল— জানবার আগ্রহ
ক্রমাগত— অবিরাম
ক্রোশ— ৮০০ হাত, দু' মাইলের কিছু বেশিপথ
ক্লান্ত— শ্রান্ত
ক্ষুদে— ছোটো
ক্ষেপে— রেগে, চটে

খ

খাঁটি— আসল, ভেজাল-ছাড়া
খাবি খাওয়া— শ্বাসকষ্টের জন্য মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া, খুব বিপদে অসহায়ভাবে হাঁসফাঁস করা
খালি— ফাঁকা, শুধু
খিঁচা— হঠাৎ জোরে টানা
খুশি— আনন্দিত, সন্তুষ্ট

গ

গগন— আকাশ
গঞ্জ— হাট, বড়ো বাজার
গাড়ায়— নীচু জায়গায়, গর্তে
গালা— একরকম গাছের লাল রঙের রস
গিরগিটি— টিকটিকি
গুণ— নৌকা টেনে নেবার দড়ি
গৃহস্থ— সংসারী লোক
গে— গিয়ে
গোয়ালখানা — গরুর আস্তানা, গোশালা

ঘ

ঘরময়— সারাঘর, ঘরজুড়ে
ঘেরাও— আটক

চ

চমৎকার— খুব ভালো
চর্বি— মেদ, শরীরের তেলের মতো জিনিস
চাগিয়ে— তুলে, উঠিয়ে
চাঙড়— বড়ো ডেলা
চাপাটি— হাতে চাপড়ে তৈরি রুটি
চূড়া— শৃঙ্গ
চির— সর্বদা
চেহারা— আকৃতি
চোয়াল— মুখের মধ্যে যে হাড়ের উপর দাঁত বসানো থাকে, হনু

ছ

ছটা— কিরণ, আলো
ছানা— বাচ্চা, চটকে মাখা
ছুঁচলো— খুব সরু

জ

জড়ো— একত্র
জবাব— প্রশ্নের উত্তর
জরুরি— খুব দরকারি
জলছবি—যে ছবি জলে ভিজিয়ে অন্য কাগজে ছাপ তোলা যায়
জিদ— একগুঁয়েমি, গোঁ, রোখ
জিয়োনো—জ্যান্ত
জীবিকা— পেশা, বৃত্তি
জোগান— সরবরাহ
জোরসে— খুব জোরে
জ্বালানি—যা জ্বালানো যায়

ঝ

ঝাঁসর—কাঁসার তৈরি বাদ্যযন্ত্র
ঝাড়— ঝোপ, একসঙ্গে অনেক
ঝুঁকি— ভার, দায়িত্ব

ট

টাটকা—তাজা
টাটে— তামার থালায়

ঠ

ঠুসি— ঠেসে, চেপে ধরে

ড

ডর— ভয়
ডাঙা— নদী বা পুকুরের পাড়
ডানপিটে—খুব সাহসী, দুর্দান্ত
ডিঙি— একরকম ছোটো নৌকা
ডুলি— দোলা
ডোঙা— ছোটো সরু নৌকা, শালতি

ঢ

ঢালু— গড়ানে, নীচু

ত

তাড়া— ধাওয়া
তুফান— দারুণ ঝড়
তুমুল— ভীষণ
তুষার— গুঁড়ো বরফ
তোড়— স্রোতের বেগ

দ

দক্ষ— পটু
দমকা হাওয়া—যে হাওয়া হঠাৎ হঠাৎ জোরে আসে
দানো— দৈত্য, অসুর
দারিদ্র্য—অভাব
দারুণ— খুব
দুচ্চার—কয়েকটা, দু'চারটা
দৌরাত্ম্য- দুরন্তপনা

ধ

ধড়ে— দেহে
ধরন— পদ্ধতি, নিয়ম, রকম
ধারণা– বোধ, কল্পনা

ন

নচ্ছার—দুষ্ট, খারাপ
নজর— দৃষ্টি
নাকাল– জব্দ
নাল— লালা
নিবিড়—গভীর
নিষ্কৃতি—মুক্তি, উদ্ধার
নীড়— পাখির বাসা
ন্যাড়া— ফাঁকা, খোলা

প

পন্থ— খোঁড়া
পরাক্রম— শক্তিশালী
পরাজিত—হেরেছে এমন, পরাভূত
পরিমাণ—মাপ, ওজন
পরেকার—পরের
পর্যটক— ভ্রমণকারী
পশম— ভেড়া ইত্যাদি পশুর লোম
পাশ— ধার, ফাঁদ
পিছু— পেছনে
পুণ্য— ভালো কাজ
পৃথক— আলাদা
প্রতিবেশী—পড়শি
পোয়া— চার ভাগের এক ভাগ
প্রতিষ্ঠিত—স্থাপিত, বিখ্যাত
প্রধান— শ্রেষ্ঠ, সর্দার
প্রসার— বিস্তার
প্রাঙ্গণ — আঙিনা, উঠান
প্রাচীন—পুরানো, সেকেলে
প্রাণপণ- যথাসাধ্য

ফ

ফাঁস— দড়ির বাঁধন
ফুকারে—ডাকে
ফোঁকর—গর্ত
ফোকল—গর্ত
ফ্যাকাশে—রক্তশূন্য, কম উজ্জ্বল

ব

বাদল— বৃষ্টি, বর্ষা
বয়স্ক—বেশি বয়স যার
বলিষ্ঠ— খুব বলবান, শক্তিশালী
বশ মানিয়ে—অধীনে এনে
বাখারি—বাঁশের ফালি
বাগিয়ে—উঁচিয়ে
বাথান—গরু চরার জমি
বায়ু— বাতাস
বাহন— যাতে চড়ে যাওয়া যায়
বিচ্ছিরি—বিশ্রী, খারাপ
বিপরীত—উল্টো
বিলকুলই—পুরোপুরি, সমস্ত
বিশাল—খুব বড়ো, বিরাট
বিস্মিত—অবাক
বুজে— বন্ধ করে
বেগ— গতি, জোর
ব্যাপার—ঘটনা, বিষয়
ব্যারাম—রোগ
ব্যস্ত— ব্যাকুল, অস্থির

ভ

ভাগে পালায়
ভারি— খুব, বেশি
ভীষণ—ভয়ঙ্কর, খুব
ভ্রূক্ষেপ- নজর, খেয়াল

ম

মড়াৎ—গাছের ডাল ভাঙার শব্দ
মত্ত— খুব খুশি, আত্মহারা
মনোবল—মনের জোর
মনোহর—খুব সুন্দর
মহোল্লাস—খুব আনন্দ
মাঝি—যে নৌকা চালায়
মাতন—মাতামাতি, গর্জন
মানা— নিষেধ
মিছা— মিথ্যা
মোকাবিলা—সামনা-সামনি বোঝাপড়া
মোচড়—পাক, চাপ

য়

য়্যাব্বড়—খুব বড়ো

র

রশি— দড়ি
রুক্ষ— কঠিন, খসখসে
রেট— দাম
রোজ— প্রতিদিন

ল

লক্ষ্মীছাড়া—দুষ্ট
লীন— মিলিত
লোকসান—ক্ষতি

শ

শিগগির—তাড়াতাড়ি
শীর্ষ— চূড়া, আগা
শুঁকে— গন্ধ নিয়ে
শুশ্রূষা—সেবা
শৃঙ্গ— পাহাড়ের চূড়া
শৈথিল্য—ঢিলেমি

স

সংকীর্ণ—খুব চওড়া নয় এমন, অপ্রশস্ত
সন্দেহ— সংশয়, অবিশ্বাস
সমতল—উঁচুনিচু নয় এমন
সমবেত—একত্র, জড়ো
সমব্যথী—সমান ব্যথা যে বোধ করে
সমেত— সুদ্ধ, সঙ্গে
সম্পদ— ঐশ্বর্য
সম্পর্ক— সম্বন্ধ, যোগ
সম্ভবত—বোধহয়, হয়তো
সর্বভুক—সব খায় এমন
সর্বোচ্চ—সবচেয়ে উঁচু
সাংঘাতিক—দারুণ, ভয়ানক
সাধ্যি— ক্ষমতা
সাবাড়— শেষ, খতম
সাম্রাজ্য—বিরাট রাজ্য
সুসজ্জিত—বেশ সাজানো
সুস্থ— স্বাস্থ্যবান, নীরোগ
সেরা— শ্রেষ্ঠ, সবার উপরে
স্তব্ধ— চুপচাপ
স্থাপন— প্রতিষ্ঠা করা
স্থির— নড়া-চড়া বন্ধ, গতিহীন

হ

হতভাগা—মন্দভাগ্য, দুর্ভাগা, দুষ্টু
হতাশ— আশাহীন, নিরাশ
হাহাকার—আর্তনাদ
হুল্লোড়— তোলপাড়, হৈ-চৈ
হেঁট— নীচু
হেন— মতো, এমন

এ বইয়ের কিছু মুদ্রিত কপিতে প্রথম কয়টি বানানের ঐক্য সম্পূর্ণ রক্ষা করা যায় নি। ১৫ পৃষ্ঠার তৃতীয় লাইনে 'উরু' ('উরু' হবে) ছাড়া অন্যত্র যে বানান আছে তা ভুল নয়, কিন্তু হয়তো দুটি গৃহীত বিকল্পের মধ্যে প্রাচীনতর এবং নবীনতর—দুটিই দুজায়গায় মুদ্রিত হয়েছে। পরে তা সংশোধন করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে যথাসম্ভব একরকম বানান শেখে সেই লক্ষ্য থেকে লেখকদের মূল রচনায় বানানও একটু-আধটু পরিবর্তন করতে হয়েছে। সূচিপত্রে 'অভিধান' 'শব্দসূচি' হিসাবে মুদ্রিত হয়েছে। এই ত্রুটিগুলির জন্য আমরা দুঃখিত।

★ পরিষ্কার জলে নিয়মিত চোখ ধোওয়া উচিত

★ সোজা হয়ে বসবে। সোজা হয়ে হাঁটবে। এতে শরীর কুঁজো হয় না

सत्यमेव जयते

No 308271 /86/KS/(3)